২৬৭০

কে কার

বা

উন্মাদিনীর প্রলাপ।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা।

২২নং নাথেরবাগান ষ্ট্রীট "আল্‌ফ্রেড যন্ত্রে" মুদ্রিত।

১৩০৮।

মূল্য ॥০ আট আনা।

শুদ্ধি পত্র।

—():*:()—

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১১	ক্রুর	ক্রূর
৩	১৬	ভুতলে	ভূতলে
৩	২২	জ্বন্য	জন্য
৪	১৬	আত্মসংযমন	আত্মসংযম
৬	২০	কুসমময়	কুসুমময়
৭	৫	কুসমকামিনীর	কুসুমকামিনীর
৭	৯	কূলা	কুলায়
৮	৩	পুত্র	পুত্র
”	১০	দেশবাসিদের	দেশবাসীদের
”	২১	দেখি।	দেখি—
৯	১৮	দুর্ল্লভ	দুর্লভ
১১	১	প্রেম-গলা-ভাবে	প্রেমেগলাভাব
”	১১	শান্তনা	সান্ত্বনা
”	১২	এইটী	এইটি
”	১৫	শয়ান	শয়ন
”	১৮	পুত্ররত্নের	পুত্ররত্নের
”	১৯	পুত্র	পুত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৪	ভগ্নিকে	ভগ্নীকে
,,	২১	কুটিল	কুটীল
,,	২২	কুটীর	কুটীল
১৩	২	হলে	হলেই
১৪	১৬	পুত্র	পুত্র
১৫	৪	বিস্শৃঙ্খলতা	বিশৃঙ্খলতা
১৭	১০	পুত্ররত্নগুলি	পুত্ররত্নগুলিকে
,,	১৩	স্বাধিনতাই	স্বাধীনতাই
,,	১৬	স্বাধিনা	স্বাধীনা
১৮	২২	হৃদয় যমুনা	হৃদয়-যমুনা
২০	২০	অন্ধ স্বাধীন	অন্ধ, স্বাধীন
২২	৭	চাণ্ডাল	চণ্ডাল
২৩	১৮	সুখের	সুখের
২৭	১২	উপর	উপর
২৮	১৫	যে	যে
৩০	৮	বার্দ্ধকের	বার্দ্ধক্যের
৩১	৩	বিদ্যুদ্দমের	বিদ্যুদামের
৩২	১৪	স্মরণাগত	শরণাগত
৩৪	১৯	শিবমিন্দুং	শিবইন্দুং
,,	১৯	ত্বমেবর্ত্তি	তমেবর্ত্তি
৩৬	৬	উজ্জ্বল	উজ্জ্বল

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬	২১	দুঃখিতা	দুঃখিত
৩৭	১৮	াগমের	বর্ষাগমের
৩৮	১৩	শশি	শশী
৪২	৬	তার	তাঁ'র
,,	১০	তাহার	তাঁহার
,,	১২	তার	তাঁ'র
,,	১৮	আজ্ব	আজ
৪৩	১২	তাপিম	তাপিনী
,,	১৮	চতুদ্দিক্কে	চতুর্দ্দিকে
৪৪	৪	পরষ্পরে	পরস্পরে
৪৫	৬	কারনেই	কারণেই
,,	৮	পাখিকে	পাখীকে
,,	১২	ভাগ্যগুনে	ভাগ্যগুণে
৪৮	৯	বৈচিত্র	বৈচিত্র্য
,,	১৪	নির্ঝরণীর	নির্ঝরিণী
,,	,,	জ্যোতিতের্ষ	জ্যোতিতে
,,	২১	বৈচিত্রতা	বিচিত্রতা
৫০	৯	নৈকট্য	নিকট
,,	১৩	ভ্রুকুটী	ভ্রুকুটি
,,	১৮	খাটীতে	খাটিতে
৫২	১	দর্পির	দর্পীর

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২	১৪	আশ্বস্থ	আশ্বস্ত
৫৩	,,	পাখির	পাখীর
৫৫	২	চিৎকার	চীৎকার
৫৭	৬	নয়ান	নয়ন
,,	২১	জীবিতে	জীবিতা
৬৪	৬	কুণ্ডুলী	কুণ্ডলী
৬৫	৭	পেয়িত	পেষিত
,,	১৩	প্রতীত	প্রতীতি
,,	১৭	উষর	ঊষর
৬৬	১০	ভাবোদ্দীপণতা	ভাবোদ্দীপনতা
৬৭	১১	কামিনীকুল	কামিনীকূল
৬৮	,,	যত্ন	যত্ন
,,	১৯	মানীনী	মানিনী
৬৯	৯	কপালটীকে	কপালটিকে
,,	১৭	শৌন্দর্য্যের	সৌন্দর্য্যের
,,	,,	জগৎবাসি	জগৎবাসী
৭১	১৩	একটী	একটি
,,	১৭	পাতী	পাতি
৭২	৫	তন্মস	তম্মস
,,	৬	বণাঙ্গিত	বর্ণাঙ্কিত
৭৩	১৪	আকর্যণীয়	আকর্ষণীয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৩	২০	বৃন্তচ্যুৎ	বৃন্তচ্যুত
৭৬	১৮	মনমু	মনমুগ্ধ
৭৯	১০	ছুটীতেছে	ছুটিতেছে
,,	১১	ঐ	ঐ
৮০	২	আকৃষ্ঞ	আকৃষ্ট
,,	৮	আতঙ্গ	আতঙ্ক
৮১	৯	উপহাস্যাস্পদ	উপহাসাস্পদ
৮৩	৬	পুত্রের	পুত্রের
,,	১২	ধ্বংশাবশেষ	ধ্বংসাবশেষ
,,	১৮	হীনপ্রভা	হীনপ্রভ
৮৫	৭	যে	যে
৮৭	৮	উদ্ধগত	উর্দ্ধগত
,,	১২	উৎপাটীত	উৎপাটিত
,,	১৩	ফুটাইরা	ফুটাইয়া
৮৮	২১	মহ ত্ব	মহত্ত্ব
৮৯	১০	আশ্বস্থ	আশ্বস্ত
৯০	৯	মরুভূম	মরুভূমি
৯১	২	শিক্ত	সিক্ত
,,	৫	মাধুরীমা	মাধুরী
৯২	৯	কপেতের	কপোতের
,,	২১	আতঙ্গ	আতঙ্ক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২	২২	জ্বলিতোছ	জ্বলিতেছে
৯৩	৫	ম্যায়	ন্যায়
৯৪	১৩	সর্ব্বভূককে	সর্ব্বভুক্‌কে
৯৫	১০	কাল্পণিক	কাল্পনিক
,,	২০	প্রেমরসশিক্ত	প্রেমরসসিক্ত
৯৬	১১	প্রাণের	প্রাণে
,,	২২	করিতে পারি না	করিতে আর পারি না
৯৭	৪	সুনামটী	সুনামটি
,,	৭	ঐ	ঐ
৯৮	১৮	কুঠীর	কুটীর
৯৯	৭	গুরুগুর	গুর্‌গুর্
১০১	২২	লালায়িতা	লালায়িত
১০৩	,,	মূর্ত্তী	মূর্ত্তি
১০৪	১৬	আরাধ্য	আরাধ্যা
১০৫	১০	সুখলাভ	সুখলাভ
১০৬	১৭	বর্যণ	বর্ষণ

কে কার

বা

উন্মাদিনীর প্রলাপ।

UTTARPARA PUBLIC LIBRARY
উত্তরপাড়া
সাধারণগ্রন্থাগার
নং ১২৭৩
ESTD. 1859

—)ঃ*ঃ(—

প্রথম উচ্ছ্বাস।

—o—

"কে কার" ইহা একটী প্রাচীন কথা, ঋষি বাক্য, বৈরাগ্যদেবীর মূলমন্ত্র, দুর্ভাগার প্রবোধমণি, সকলে জানে, আমিও জানি, কিন্তু এই কথাটীর নিগূঢ় অর্থ আজ বুঝিতে চাই। সতিনী-তাপিনী উন্মাদিনীর এই কথাটী দিবারাত্র জপমালা হইয়াছে। সকল কথা ভুলিয়া এই কথাটীই তার জীবনের সার কথা হইয়াছে, তাই ইঁহার প্রকৃত অর্থান্বেষণে আজ মন অত্যন্ত ব্যাকুল। হইয়াছে।

মহাজনীপদ ভাবিয়া এই কথার অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয় পৃথিবীর সমস্তই নশ্বর, জগতের কোন সম্বন্ধই চিরস্থায়ী নয়—সুখ দুঃখ সমস্তই স্বপ্নবৎ-কাল্পনিক; সংসারের স্নেহযত্নাদি সবই ভোজবাজী

মায়ার খেলা ; আপনার দেহই আপনার নহে—কে কার ? আমরাই বা কে ? কেহ কাহারও নয়। এই শোক-সন্তাপ পরিপূর্ণ জগতে একা আসিতে হয়, জ্বলন্ত সংসারের উত্তাপে ঝলসিয়া, জীবনের অগ্নিপরীক্ষা দিয়া, একাই যাইতে হয়। আমার সঙ্গে কেহ পোড়ে না—আমার সঙ্গে কেহ যায় না—তাই ভাবি "কেহ কাহারও নয়"।

ঋষি বাক্য আমার মনের সঙ্গে মেলে—তবে আমি কি ঋষি হইয়াছি ?—না হইয়াছি কিসে ?—অযোধ্যা-ভূষণ রঘুকুলমণির বিরহে অযোধ্যাবাসিগণ যেরূপ ঋষি হইয়াছিলেন—ক্রুর অক্রূর ব্রজের জীবন, প্রাণকৃষ্ণধনকে হরণ করিলে—কৃষ্ণপ্রাণা গোপিনীগণ কৃষ্ণবিচ্ছেদে যেরূপ ঋষি হইয়াছিলেন, আমিও আজ সেইরূপ ঋষি হইয়াছি।

তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়গুণাবলম্বী হইয়াছিলেন, ইন্দ্রিয়াদির ভোগ লালসা বিরত তাঁহাদের মন, অন্য কামনা শূন্য হইয়াছিল—বিষয় চেষ্টা না থাকায় তাঁহাদের অপরেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইত না। বাতাহারে, অনাহারে থাকায়, উদরের জন্য কোন উদ্যোগের আবশ্যকতা ছিল না ; রোগ, শোক, জ্বালাযন্ত্রণাদি কিছুই অনুভব হইত না—সুখাশা আমোদ, হাস্য-কৌতুক সব পরিত্যাগ হইয়াছিল—আশারহিত মন

কোন ক্লেশই অনুভব করিত না—আকাঙ্ক্ষা, বাসনাদি তৃপ্তির জন্য চঞ্চল হইত না। ঋষিরা এক পরমধনের লোভে সকল লোভ পরিত্যাগ করেন—একজনের ধ্যানে একাগ্রমনে নিমগ্ন থাকেন, সংসারের মায়া থাকে না—নীরবে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে থাকে—পবিত্র প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেহত্যাগের আশঙ্কা আসে না—মরণে ভয় হয় না—তাই ভাবি অযোধ্যাবাসী ব্রজবাসীগণ ঋষি হইয়াছিলেন; তাই বলি আমিও আজ ঋষি হইয়াছি, তাই ঋষি বাক্য আমার সহিত মিলিতেছে।

আবার ভাবি, মায়া-মোহ মুগ্ধা এ উন্মাদিনী কিসে ঋষি হইল?—এ জগৎ মোহময়—মোহ একটী জগৎ বন্ধন, মোহে আমরা সব দেখিতে পাইনা—দেখিয়াও ভুলিয়া যাই—তাই পাপের যাতনা ভুগিয়াও লোকে আবার পাপ করে। এই মোহই আমাদের পথভ্রম ঘটাইয়া দেয়, মুক্তিপদাভিলাষীর শত্রু হইয়া মন ফিরাইয়া দেয়। এই মোহই স্বর্গবাসী মনকে ভূতলে পাঠাইয়া দেয়, সন্ন্যাসীকে সংসারী ও বনবাসীকে গৃহী করিয়া ফেলে। এই মোহঘোরেই পর আপনার হয়, নিরাশাপ্রান্তরে আশাবৃক্ষ রোপিত হয়, মরুভূমে জলভ্রম ঘটিয়া থাকে, শত্রুকে মিত্ররূপে ভাবিতে পারি। মোহ পরহিতকারী. ইহারই সাহায্যে তাপিনীর তাপ নিবারিত হয়। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা দীর্ঘকালের জন্য

হৃদয়ে স্থান পায় না—হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না, তাই পূর্ব্বস্মৃতির বৃশ্চিক—দংশন জ্বালায় সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতে হয় না। অন্তর্নিষ্পেষিত চিত্র, মর্ম্মভেদী বাক্য, সর্ব্বদা স্মরণপথে থাকিয়া তীব্র যাতনা দিতে পারে না। মোহের প্রভাবেই লোকে অসৎ বিষয়কে সৎ বলিয়া গ্রহণ বা স্থির করিয়া থাকে, দুঃখে পড়িয়াও সুখানুভব করে।

সেই মোহ আমায় আজ ত্যাগ করিয়াছে, পূর্ব্ব স্মৃতির জ্বালা নিবিল না, যাতনাদায়ক চিত্র, বাক্য ভুলিতে পারিলাম না, নিরাশবক্ষে আশাবীজ রোপিত হইল না, দুঃখে পড়িয়া অবধি আর সুখ পাইলাম না, তাই জানিয়াছি আজ আমি মোহ মুক্ত।

যে ধৈর্য্যের সাহায্যে অনেক দুঃসহ কষ্ট সহনীয় হয়। যে ধৈর্য্য কামিনীর ভূষণ, সংসারের অতি প্রয়োজনীয় ধন, ধর্ম্মের রক্ষক, দুঃখ লাঘবের প্রধান আশ্রয় সে ধৈর্য্য গেল, আত্মসংযমন গেল, সদসৎ বিবেচনা গেল, প্রাণে মায়া গেল, বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল, তবু মোহ আসিল না ; তাই ভাবিতেছি, বুঝি আজ মোহ জন্মের মত আমাকে ত্যাগ করিল। আমার প্রতি মোহের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে "কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেওয়া হয় কই" হৃদয়ের অন্তস্থল তুষানলে ঝলসিয়া উঠে কই ? প্রাণে অবিরাম এ জ্বালা জ্বলিতে থাকে কই। চাই,

তাই আসিল না, মোহ আসিল না অথচ উন্মাদিনী হইলাম। সংসার-জলধিতলে সেই রত্নটীকে আপনার করিয়া লইতে গিয়া ভাসিয়া গেলাম। শ্বাপদ-সঙ্কুল মহারণ্যে আশ্রয় লইতে গিয়া তাড়িতা হইলাম, তখনও মোহের দেখা পাইলাম না। কত যত্নে আহ্বান করিলাম, বিনীত ভাবে অনুনয় করিলাম, প্রাণ ভরিয়া স্তব স্তুতি করিলাম, তথাচ মোহের দেখা পাইলাম না! পাইব কেন আমার তো এখন কষ্টের শেষ হয় নাই। যাহার দুঃখের শেষ হয়, তাহাকে মোহিত করিতে মোহের শুভাগমন হইয়া থাকে। আজ মোহ আমার নিকট আসিলেন না, তাই ভাবিতেছি আজ আমি মোহ মুক্ত ঋষি হইয়াছি।

ঋষি হইলেই, কে কার? কেহ কাহারও নয়, এ অর্থ করেন কেন! বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না বিনা কারণেও এই অর্থ হয় নাই। যাঁহারা সংসারের মায়া কাটাইয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন "মায়া না থাকিলে কে কার কেহ কাহারও নয়"।

এ অসার জগতের কাল্পনিক সুখে যাঁহারা জলাঞ্জলি দিয়াছেন, যাঁহাদের মন ও আত্মা সেই চিন্ময় পরমাত্মাতে মিশিবার জন্য জগৎ ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, স্বর্গগামী হইয়াছে, তাঁহারা বলিতে পারেন এখানে ভবের ধুলা খেলা খেলিতে পক্ষাপক্ষ, পরীক্ষা দিতে এক

স্থানেতে সংযোগ, কর্ম্মফল ভুগিতে সম্বন্ধের বন্ধন, ক্লেশ পাইতে আত্মপর ভেদ জ্ঞান ঘটিয়া থাকে; নচেৎ এ জগৎ একটী বিদেশীর পান্থশালা এখানে কেহ কাহারও নয়।

যাহাদের দেহে যত্ন নাই, দেহ ধারণ পাপের ফল বলিয়া ধারণা হইয়াছে; এ জগতে আসিয়া জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোকাদির জ্বালা যন্ত্রণা আর না ভুগিতে হয় এই যাহাদের আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা, তাঁহারা ঐ অর্থ করিতে পারেন।

কিন্তু জগজ্জন এই অর্থ করে কেন? এ অর্থে ত্রিজগৎ চলিত না; শুকদেবের ন্যায় সকলে বনে যাইত মনুষ্য জাতির ধ্বংশ হইত? স্ত্রী, পুরুষ, পুত্র কন্যা, জ্ঞাতি কুটুম্ব, স্বদেশী বিদেশী, দাতা, ভিখারী, রোগী চিকিৎসক, ছাত্র পণ্ডিত, তরু লতা, ফুল ফল, জল বায়ু, আপনার পর, প্রভৃতি লইয়া জগৎ সংসার—তাই জিজ্ঞাসা করি জগৎ সংসারে এই অর্থ প্রচলিত কেন?

পৃথিবীর রচনা কৌশল প্রকৃতি দেবীর ভাব, স্বভাবের নিয়ম, দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ইহ জগতের জন্য কে কার, কেহ কাহারও নয় এই অর্থ হয় নাই। যখন দেখি কুসমময় লতিকা ছুটিয়া তুলিয়া প্রিয়তরুবরকে আলিঙ্গন করিতেছে প্রসূণ মধুকণা দানে আশ্রয় বৃক্ষকে শীতল করিতেছে;—শরতের

উজ্জ্বল শশী, উজ্জ্বল নীলাম্বরে রূপের ছটা বিকাশিয়া শীতলকর দ্বারায় কুমদিনীর লজ্জার মান ভাঙ্গিতেছেন; দিনমণিকে দেখিয়া পঙ্কজিনী ঘোমটা খুলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন; সন্ধ্যা সমাগমে ফুলকুল আনন্দে মুখ খুলিতেছেন; মধুভরা কুসমকামিনীর মধুপানে মধুপ নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছে; বিরহিনী চক্রবাকী, দুঃখের নিশাবসানে সরস অন্তরে চক্রবাক সহ মিলিত হইতেছে—পক্ষীকুল নিজ আহার পরিত্যাগ করিয়া, শিশুশাবকের আহারান্বেষণে বিচরণ করিতেছে; শাবকগুলিকে কূলা নির্ম্মাণ করিয়া যত্নে ও সতর্কে প্রতিপালন ও রক্ষা করিতেছে—কুরঙ্গিনী পুলকিত হৃদয়ে কুরঙ্গের গাত্র লেহন করিতেছে, গাভী বৎসরবে আহার ত্যাগ করিয়া ছুটিতেছে, ব্যাধের বংশীধ্বনীতে হরিণী প্রাণ দিতেছে, যে ভ্রমর কঠিন কাষ্ঠ অনায়াসে ভেদ করিতে পারে, সে আজ মুদিত—অরবিন্দ—গহ্বরে মনের সাধে আবদ্ধ হইয়া আছে; এই সকল দেখিয়াই বলি জগৎ সংসারের জন্য—আশ্রমীদের জন্য এ অর্থ প্রচলিত থাকিতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি, প্রকৃতি, স্বভাব ও রুচির লোক লইয়া আশ্রম, দয়া ধর্ম্ম, স্নেহ যত্ন, আদর অভিমান দোষ ঘাট, আমোদ কৌতুক, হাঁসি কান্না প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রবণতা ও ভাব লইয়া সংসার—তাই সংসারী সহজে সকল ভাবগ্রাহী হইতে পারে; স্নেহার্দ্র

হৃদয় পিতামাতার নিকট বাৎসল্যভাব; প্রেমময়ী সহধর্ম্মিনীর নিকট প্রীতিযোগ, প্রাণাধিক সুহৃদের নিকট সখ্যভাব, সুশীল ও ধার্ম্মিক পুত্রের নিকট ভক্তিভাব অনায়াসে অনুভব ও অভ্যাস করিতে পারে—তাই বলি সংসার ধর্ম্ম প্রধান ধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম পুস্তকে "কে কার! কেহ কাহারও নয়" এ অর্থ খাটে না।

এ সংসারে ধর্ম্ম বিশেষে প্রণয় বিশেষে, কার্য্য বিশেষে মন্তব্য বিশেষে, স্বার্থ বিশেষে সকলেই সকলকার। ধর্ম্ম বিষয়ে সহানুভূতি হেতু এক ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসিদের মধ্যে মিলন হইয়া থাকে; উমীব্যক্তি কার্য্য সাধনের জন্য আসিয়া আলাপ করে; মন্তব্য সাধনের জন্য শত্রু আসিয়া সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে চায়—স্বার্থ সাধনের জন্য অপরিচিত ব্যক্তি ঘনিষ্ঠতা করিয়া থাকে, প্রণয়ে পর আপনার হয়, কিন্তু অপ্রণয়ে আপনার লোকও পর হয়; তাই বলি কারণ বিশেষে সকলেই সকলকার।

তবে "কেহ কাহারও নয়" এই অর্থ করি কেন? করিবার কারণ আছে। স্বামী-বল্লভা আদরিনীকে যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা ও তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব-পতিকে তরঙ্গায়িত হৃদয়ে সজলনয়নে পার্শ্বোপবিষ্ট থাকিতে দেখি। পরে দেখি যে কামিনীর জ্যোতিহীন স্তিমিত নয়নদ্বয় সেই পতির অনুপমবদনের উপর নিক্ষিপ্ত, ঘন

ঘন শ্বাস প্রবাহিত, অধরোষ্ঠ কম্পিত, যেন বলিতেছে "যাঁহাকে কিছুক্ষণ নয়নের অন্তর রাখিলে, চারিদিক শূন্য দেখিতাম, সেই হৃদয়রত্নকে আজ কার নিকট দিয়া যাইব, কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাইব—অনন্ত পর-জগতে সুখী হইবার জন্য, যাঁহাকে সঙ্গে লইবার বাসনা ছিল, তাঁহাকে আজ কেমন করিয়া ফেলিয়া যাইব. আর যে দেখিতে পাইব না" ইত্যাদি মৃত্যুকালের মনের কথা গুলি সমস্ত বলিবার অবসর না দিয়া, নির্দ্দয় কাল যখন প্রাণের আশা অতৃপ্ত রাখিয়া, পতির নিকট হইতে সবলে পত্নীকে কাড়িয়া লইল, তখনই ব্যাকুল হইয়া বলি —"কেহ কাহারও নয়"।

যে জননী প্রাণাধিক পুত্রের সামান্য পীড়ায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন. চিন্তাসাগরে নিমগ্না হন, সেই সর্ব্বস্বনিধিকে, জন্মের মতন হারাইয়া আবার যখন সেই হতভাগিনী জননীকে শয়ন, ভোজন, কথোপকথন করিতে দেখি ; শোক চিহ্ন কালক্রমে তিরোহিত হইতে দেখি তখনই ক্ষোভে বলি "কেহ কার নয়"।

আবার যখন দেখি দুঃখিনী অনাথিনী রমণী, দুর্ল্লভ পতিধনে বঞ্চিতা হইয়া এ ছার সংসারে অসার দেহভার বহিয়া বেড়াইতেছে ; পোড়া পেটের দায়ে, পোড়া মুখে অন্ন দিতেছে ; পোড়ার মুখ খুলিয়া কথা কহি-তেছে; যে ক্ষণকালের জন্য নয়নান্তর হইলে অনন্তব্যথায়

অন্তর্ভেদ হইত, সে চির দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল তথাপি দেহ হইতে প্রাণের অন্তর হইল না; যাহার প্রণয় সম্ভাষণে হৃদয় গলিয়া যাইত, হৃদয়কমল উৎপাটিত করিয়া যাহার শ্রীচরণে প্রেমের উপহার দিতে ইচ্ছা হইত, তাহার চিরবিচ্ছেদ বজ্রাঘাতে, সেই হৃদয়কমল ঝলসিয়া গেল না, প্রাণবায়ু বিতাড়িত হইল না তখনই বিস্ময়ে বলি "কেহ কাহারও নয়"।

যাঁহার সঙ্গে সব যায়, এসংসারে সুখ, হৃদয়ের শান্তি, দেহে যত্ন, প্রাণে আস্থা সব যায়; জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য ধুইয়া যায় আদর, সোহাগ, আমোদ, আহ্লাদ সব অন্তহিত হয়; তাঁহারে ছাড়িয়া আবার সব থাকে। সুখের সামগ্রী সব তাহার সঙ্গেই চলিয়া যায়, কেবল দুঃখের দ্রব্য সব পড়িয়া থাকে—পুড়িবার জন্য দেহ থাকে, শোকবিদ্ধ হইবার জন্য হৃদয় থাকে, জ্বলিবার জন্য প্রাণ থাকে, কাঁদিবার জন্য নয়ন থাকে, ব্যথা পাইবার জন্য মন থাকে, আর ক্রমান্বয়ে তুষানলে দগ্ধ হইবার জন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকে—তাই বলি সুখের সামগ্রী চলিয়া যায়, দুঃখের দ্রব্য পড়িয়া থাকে—ভাল যায়, মন্দ আসে, মন্দের সঙ্গে ভাল আর আসে না, সমানে সমান না হইলে মেলে না—তাই মন্দের সঙ্গে ভাল মিশিতে পারে না; সেই জন্যই আলোক গেলে অন্ধকার আসে; আশা গেলেই নৈরাশ্য আসে; মিলন সুখ গেলে বিরহ যন্ত্রণা

আসে ; সরসতা গেল নিরসতা আসে; প্রেমে—গলা—ভাব তিরোহিত হইলে শোককাঠিন্য ভাব আসে ; জীবনে যত্ন যায়, মৃত্যু কামনা আসে, তাই বলি, ভাল গেলে সেই স্থানে মন্দ আসে—পূর্ণিমা যায়, অমাবস্যা আসে, সুদিন যায় দুর্দ্দিন উপস্থিত হয় আনন্দ যায় ক্রন্দন আসে। যাঁর অভাবে কামিনীর সমস্ত সুখের অভাব হয়, যিনি অকৃত্রিম প্রণয়ের সরল চিহ্নের স্বরূপ সেই জীবনাধিকা সাধ্বী পত্নীকে শোক-সন্তাপ-দুঃখময় অপার পারে ফেলিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে চিরসুখময় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; দেখা দিতে বা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না—শান্তনা করিতে নামিতে চান না, তখনই মনে স্বতঃই এইটী উদয় হয় যে, এ সংসার ছাড়িলে কেহ কাহারও থাকে না, কেহ কাহারও নয়। আর যখন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে রুগ্ন-শয্যায় শয়ান করিয়া থাকিতে দেখি, শয্যার পার্শ্বে অভাগিনী পত্নীকে শোক বিহ্বলা পাগলিনীর ন্যায় অস্থিরা দেখি, অভাগিনী দুঃখিনী জননীকে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পুত্ররত্নের চাঁদমুখে পড়িয়া নিদারুণ শোকা-শঙ্কায় রোদন করিতে দেখি, প্রাণ পুত্তলি সম পুত্র কন্যাদের মলিন মুখে অজস্র অশ্রুবর্ষণ হইতে দেখি, তখন একবার মনে হয় “কি সে কে কাহারও নয়” আবার পরক্ষণেই যখন ভাবি অল্পক্ষণের মধ্যে

এই জগৎ ছাড়িতে হইবে ; আর সেই সঙ্গে জগতের স্নেহ, মায়া, বন্ধন সব শিথিল হবে—কাহার সঙ্গে আর সম্বন্ধ থাকিবে না, কাহার রোদন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না, কাহার জন্য কাঁদিতে আসিবে না, কাহাকেও প্রবোধ দিতে আসিবে না—তখনই বৈরাগ্যে বলি "কেহ কাহারও নয়"।

কিন্তু যখন প্রেমভরে পত্নীকে পতিপার্শ্বে বসিয়া, ধরিতে বাঁধিতে ঢুলিতে দেখি ; ভাবতরঙ্গে উভয়কে খেলিতে দেখি, প্রেম লহরীতে ডুবিতে ও ভাসিতে দেখি আবার সেই চির আদরিনী গরবিনী বাসন্তী লতিকাকে পতির অসুখে মলিনা ও শুষ্কা হইতে দেখি— মাতাকে পুত্র ক্রোড়ে করিয়া, সেই চাঁদমুখ চুম্বন করিয়া সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিতে দেখি ; ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মরণ হইয়া আনন্দে ভাসিতে দেখি ; ভগ্নিকে ভাইয়ের জন্য কাঁদিতে দেখি, পরকে পরের জন্য কাতর দেখি তখন কেমন করে বলি "কেহ কাহরও নয়"।

যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসি. হৃদয় পূরিয়া যত্ন করি, মন খুলিয়া ভক্তি করি, সে আমাকে আজ বিস্মরণ হইল তাই দুঃখে ও কাতরে বলি "কেহ কাহারও নয়" নতুবা ভালবাসায় এ অর্থ নাই, ভাবুকে শোনে না, প্রণয়ী মানে না। এই কুটিল অর্থ যখনই মনে উদয় হয়, কটীর ভাবের ফল হৃৎকম্পন. দুশ্চিন্তা অন্তরকে অধি-

কার করে। "কেহ কাহারও নয়" তবে কি তিনি আমার নন্—এই মনে হলে আতঙ্কে বলি, দুরাশার দাসী হইয়া বলি—পূর্ব্বের সুখ যে সুখের তুলনা নাই, সীমা নাই, কুলকিনারা নাই, যে সুখ স্মরণে এখন জীবিতা থাকিয়া উন্মাদিনী হইয়াছি, সেই সুখ স্মৃতিপথে আসিলে প্রমত্তা হইয়া বলি, আমি এ অর্থ বুঝিলাম না এ অর্থ খাটিতে পারে না।

আবার যখন ভাবি "কেহ কাহারও নয়" তবে কি আমি তাঁর নয়? তখনই সগর্ব্বে বলি ইহা একটী আরোপিত অর্থ, এ অর্থ সতীর কর্ণে স্থান পায় না, মনে উদয় হইলে দারুণ যমযন্ত্রণা ভীষণ নরকভোগ কষ্ট উপস্থিত হয়, তাই বলি এ অর্থ সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা অথবা হিংসুকের কথা, ভাল না হইয়া মন্দ হউক জগতে একতা না থাকুক তাহারই কথা। যে সমাজে জীবহীন দেহ অপবিত্র হয়, শব বাটী হইতে বাহির করিলে গোবর জলের ছড়া দিতে হয়, যে মুখে অগ্নিকার্য্যের প্রথামতে প্রাণতম প্রিয়জনের মুখে আগুণ দিতে হয় স্নানান্তে তিক্ত নিম্বপত্র দন্তে কাটিতে হয়, সেই হৃদয়-প্রাণ-মমতাহীন সমাজে, পোড়া দেশের একতাহীন সমাজে এই অর্থ খাটিতে পারে আমাদের কথা আমাদেরই বেশ খাটিয়াছে।

যে একতার অভাবে আজ আমি উন্মাদিনী যে

একতা সম্পত্তি হারাইয়া আমি আজ ভিখারিণী যে একতার বিহনে আমি জীবন্মৃতা সেই একতা নষ্টকারী এ অর্থ কর্ণে মনুষ্য জীবনে স্থান পাইতে পারে না। একতাই মনুষ্য জীবন; ধমণী, শিরা, শোণিত মেদ অস্থি, নাসিকা কর্ণ, হস্তপদাদি সমবেত করিয়া মানবের জীবনাধার দেহ,—শ্বাস প্রশ্বাস, পোষণ, শোষণ, সঞ্চালন নির্গমনাদি দেহের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সমষ্টি লইয়াই মনুষ্য জীবন। একতাই আবার জাতীয় জীবন।

এক এক জাতি এক এক সাধারণ উদ্দেশ্যে মিলিত এক এক রকমের পাতা ফুল ফলাদি লইয়া এক এক জাতি বৃক্ষ বা লতা, নানাজাতি ফল বৃক্ষ একত্রিত করিয়া একটী ফলের বাগান, ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প একত্রিত করিয়া একটী পুষ্প্র বন তাই বলি একতা জাতীয় জীবন। একতাই সংসারের সার, পিতা মাতা, স্ত্রী, পুত্র ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন এক থাকিলেই সংসারে সুখ ও সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে,—স্নেহ মায়া, দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা পরোপকার, উদারতা, সরলতা প্রভৃতি গুণ-রাশি একত্রিত হইলেই সংসারে শান্তি পাওয়া যায় তাই বলি একতাই শান্তিপ্রদ। যে সংসারে একতা আছে সে সংসারে সব আছে সুখ আছে দুঃখের ভাত সুখ করিয়া খাওয়া আছে, আমোদ আহ্লাদ, ক্ষমা সাহায্য,

আদর যত্ন, হাঁসি কৌতুক সবই আছে। একতাই উন্নতির সোপান, পরস্পর ঐক্য বাক্য না ইহলে উন্নতি হয় না। যে দেশে, যে সমাজে একতা আছে সেখানে বিবাদ, কলহ বিশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা অত্যাচার, অবিচার প্রতারণা কপটতা কিছুই নাই সেখানে স্বর্গ সুখের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই একতা বিহনে স্বর্গ সুখে বঞ্চিতা হইয়াছি। সে আমার সঙ্গে আর এক হইতে চায় না; মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে, নয়নে নয়নে মিলাইয়া এক হইতে চায় না—আমার ক্রন্দনের সহিত তাহার হাসি, আমার কঠিন প্রাণের সহিত তাহার কোমল-প্রাণ আমার শোকাশ্রু সহিত তাহার আনন্দাশ্রু আমার যত্নের সহ তাহার সান্ত্বনা, আমার আশঙ্কা সহ তাহার অভয় বাক্য—আমার বিরহ জ্বালার সহ তাহার মিলন বারি মিশাইতে চায় না—তাই আজ আমি সর্ব্ব সুখে বঞ্চিতা হইয়াছি, তাই বিরহের নিদারুণ যাতনাদির অধীনা হইয়াছি—একতার অভাবে আজ দুঃখিনী পাগলিনী হইয়াছি। হায়! হায়! হায়!—যে একতা দেশে নাই—সমাজে নাই—তাহা ঘরে পাইবার প্রত্যাশা—দুর্ব্বলের নিকট বলের সাহায্য চাওয়া—কৃপণের নিকট অর্থাকাঙ্ক্ষা—নির্দ্দয়ের নিকট দয়ার প্রার্থনা করা—প্রস্তরের নিকট জলভিক্ষা করার ন্যায় দুরাশা মাত্র। পরমুখাপেক্ষী

সুখ—পরান্নভোজী, পরাধীনা যশোলিপ্সার ন্যায়—বিদ্যুদ্দামের ন্যায়—পদ্ম পত্রস্থনীরের ন্যায়, জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল। এই পরহস্তগত রত্নের জন্য আর লালায়িত হইব না। পণ্ডিতপ্রবর চাণক্যের উপদেশ অনুসারে "পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞান করিয়া সুস্থির হইব। আর পরাধীনা হইব না—তাঁহার ভালবাসা স্নেহ যত্নের—অথবা উহাদের অভাব হেতু—নৈরাশ্য তাড়না, বিরহ যন্ত্রণাদির অধীনা থাকিব না। আজ স্বাধীনা হব—স্বাধীনতাই সকল সুখের আকর, স্বাধীনতাতেই স্বর্গ—চতুর্ব্বর্গ। স্বাধীন শাকান্ন, পরাধীন রাজভোগাপেক্ষা মিষ্ট ও মধুর—স্বাধীনের মৃত্তিকাশয্যা, পরাধীনের, স্বর্গপালঙ্কাপেক্ষাও প্রীতিপ্রদ; সুখের স্বাধীন জগতে পরাধীন চিরসুখে বঞ্চিত হয়। জগৎপিতার প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছা—স্বাধীন ইন্দ্রিয়াদিকে পরাধীন করিতে হয়। স্বাধীনতাসুখ, বনের পশুপক্ষীরাও বুঝিতে পারে, তাই লোকালয় ত্যাগ করিয়া—বনে জঙ্গলে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে—প্রাণ দিতে স্বীকার, তবু ধরা দিতে চায় না—বাঁধা থাকিয়া রাজভোগে ভোগী হইতে চায় না, তাই শিকল কাটিতে, বন্ধন ঘুচাইতে এত যত্ন পায়; সুবিধা পেলেই, অবসর হইলেই স্বাধীনতার ক্রোড়ে দৌড়িয়া গিয়া, কটু কষায় ফল ভক্ষণে বা অনাহারে তৃপ্তিলাভ করে—মনের শান্তি

পায়।—তাই দেখিয়া বুঝিয়াছি—সুখের আকরই স্বাধীনতা।

যে স্বাধীনতা লাভ জন্য—কত অগণিত মানব-জীবন উৎসর্গিত হয়—কত রক্ত নদী বহিয়া থাকে—কত পর্ব্বত ভূমিস্মাৎ হয়—কত শোভাময়ী স্থান প্রান্তর, কত জনাকীর্ণ সহর নির্জ্জন মহারণ্যে পরিণত হয়; যে স্বাধীনতা-রত্নের বিনিময়ে কত শত দুঃখিনী জননী পুত্রশোকে জর্জ্জরিতা হইতে, কত শত বিধুরা কামিনী পতিহীনা অনাথিনী হইতে, কত শত বৃদ্ধ পিতা শেষ জীবনের আশা ভরসা, আশ্রয় অবলম্বন—পুত্ররত্ন-গুলি জন্মের মত ছাড়িয়া দিতে বিমুখ হন না; যে স্বাধীনতা পরম ধনের জন্য, কত শত বালক বালিকা এক নিমেষ মধ্যে পিতৃহীনা হইতেছে, সেই স্বাধিনতাই যে অতুল সম্পদ সংসারের অমৃত—সুখের আকর, তাহাতে প্রার সন্দেহ কি?—এ দুঃখিনী সুখলাভাশায় আজ স্বাধিনা হইবার জন্য কাতরা ও চঞ্চলা হইয়াছে—দুঃখ কষ্ট আর সহ্য হইতেছে না বলিয়া—জীবনের শেষ দিন কয়েকটী অসীম আনন্দে সুখভোগে অতি-বাহিত করিতে—স্বাধীন হইব। সুখ ভোগ করিতে আমি কে? সুখের আবাস যে মন—মনের সংযোগ বিনা ইন্দ্রিয়াদির কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় না—কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় না—কিছুতেই সুখ পাওয়া

যায় না। নিরাসনে বনে বসিয়া, নিম্বপত্র ভক্ষণে যোগীরা যে সুখের আস্বাদন গ্রহণ করেন, রাজাধিরাজ মনোহর অট্টালিকায় বসিয়া—রাজভোগ উপভোগে সে সুখ পান না; সৎপথীর সরল হৃদয়ে সে সুখ বিরাজ করে, অসৎ ধনীর কুটিল হৃদয়ে সে সুখের স্থান নাই। স্বাধীন হইলেই সুখ পাওয়া যায় না, সুখ বাহ্য জগতে নাই—মনই সুখের আকর।

বস্তুর স্বরূপ গত ধর্ম্ম—সর্ব্বদা সমানভাবে বস্তুতে বিদ্যমান থাকে—কেবল মনের অবস্থাভেদে ভাবের আরোপন হইয়া থাকে। প্রকৃতি দেবী নভোমণ্ডলকে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলীর দ্বারায়—ধরাকে বৃক্ষ লতা, ফুল ফল দ্বারায় বিভূষিত করিয়াছেন—জগৎ প্রাণীকে নানা সাজে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন—মনের ভাব বিপর্য্যয় হেতু—সেই সকল ভাল সাজ আর ভাল লাগে না। যে বেশ-ভূষায় ভূষিতা হইবার জন্য—তাঁর মন ভুলাইবার জন্য—সোণার উপর ডাইমন কাটিবার জন্য—অগ্রে কত ভাল লাগিত—কতই ব্যস্ত হইতাম—সেই বেশ ভূষাকে আজ বিলাসলীলার সামগ্রী—অভাব মোচনের আড়ম্বর—কৃত্রিমতার আশ্রয় বলিয়া ঘৃণা করিতেছি—তাই বলি, মনের প্রবণতার সহিত ভাবের স্রোত বহিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সুধামাখা স্বর কর্ণে বংশী-ধ্বনি সম বাজিত—হৃদয়, যমুনা-পুলিনে উজান বহিত—

সেই বংশীধ্বনি আজ কাঁদায় কেন? সেই অমিয় বাক্যের ভাব—আর পূর্ব্বের ভাবাপন্ন নহে—সে বাঁশী আমার মন প্রাণ, কর্ণকে শীতল করিবার জন্য আর ধ্বনিত হয় না—এখন যাকে শীতল করিবার জন্য বাজে—সেই জুড়াইবে—বৃন্দাবনচন্দ্রের বাঁশী "রাধে, রাধে"বলিয়া বাজিত—তাই রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার মন প্রাণ ভিজিয়া যাইত—চন্দ্রাবলী কি কুব্জা সুন্দরী বলিয়া বাজিলে—রাইরাজার মনস্তুষ্টি হইত না। হৃদয় যন্ত্রে মনের তার যেরূপ উচ্চ বা নীচ সুরে বাঁধা থাকে—বাহ্য বস্তুর প্রতিঘাতে সেই সুরে বাজিয়া থাকে—তাই, জগৎ মোহিত কোকিল-স্বর—বিরহিনীর কর্ণে শেলাঘাত করে—সৌরভময় কুসুমহার বক্ষে সর্পদংশন করে—হিমাংশুর শীতল কিরণ নয়নকে দগ্ধ করে—মলয়া মারুত অগ্নিশিখার ন্যায় দেহকে ঝলসিয়া দেয়। নিশামণির উদয়ে—নিশা ও কুমুদিনী হাসিতে থাকে—আর চক্রবাকী ও সরোজিনী ম্রিয়মাণা হইয়া থাকে—দিঙ্মণ্ডল ঘনঘটাচ্ছন্ন হইলে—সকলেই ভীত হয় কেবল সুখের শিখিনী আনন্দে নাচিতে থাকে—তাই বুঝিয়াছি—সুখ বাহ্য জগতে নাই, সুখ কেবল মনে—তবে মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তবে স্বাধীন হবো—মনের মন না হইলে—সুখাশায় স্বাধীন হইবার চেষ্টা বিফল, যত্ন বিড়ম্বনা মাত্র, তবে আজ মনকে

ডেকে জিজ্ঞাসা করি—ও মন! মন! মন!! 'আজ তুমি কি স্বাধীন হবে? স্বাধীন হলে সুখ পাবে—আর দুঃখ পাবে না—মনের কোন উত্তরই নাই—হায়! হায়!! হায়!!! মনে কি আর মন আছে, মন আজ হতচেতন হইয়া আছে—অনেকবার ডাকিবার পর মনের চৈতন্য হইল—ঘোর ভাঙ্গিল—গম্ভীর স্বরে বলিলেন স্বাধীন হবো কি? এ জগতে কেহই স্বাধীন নহে—জল বায়ু সময় কাল চন্দ্র সূর্য্যাদির অধীন হইয়া যে মানবজাতিকে শারীরিক ও মানসিক সুখলাভ করিতে হয়, যে মানবজাতি—চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের অধীন—ভাবের অধীন—রোগ শোক, লোভ ক্রোধ দয়া ধর্ম্ম, ভক্তি প্রেম, মায়া মোহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জন্ম মৃত্যুর অধীন সে জাতি কিরূপে স্বাধীন হবে। স্বাধীনতায় সুখ কি? বিশেষতঃ স্ত্রীস্বাধীনতায় সুখ নাই—ডালে ভর না দিলে লতা আনন্দে দুলিতে পারে না—মেঘবক্ষে না খেলিলে চপলার শোভাবৃদ্ধি হয় না—আর সাগরে বা নদে, নদী না মিশিয়া থাকিতে পারে না—বামন হয়ে চাঁদে হাত কেন? পঙ্গুর গিরি উল্লঙ্ঘনের যত্ন কেন? ভগবান্ যে ভাবে রাখেন—সেইভাবে থাক সুখাশায় অন্ধ স্বাধীন হইতে চাও—কিন্তু স্বাধীনতায় সুখ নাই।

আমি বিস্মিত হইলাম—ভাবিলাম হায়, হায়, কি

হইল—মনও আমার পাগল হইয়াছে—অথবা অনভ্যাস হেতু—অনেকদিন দুঃখ ভুগিয়া—স্বাধীনতার সুখ—স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইয়াছে—স্মরণে আনিবার জন্য—অধীনতার কষ্ট, স্বাধীনতার সুখ—সমস্ত বুঝাইলাম - অনেক রকম করিয়া বলিলাম—কিন্তু স্ত্রীলোকের উপদেশ কেহ গ্রাহ্য করে না—আশ্রয়হীনা অবলাকে কেহ মানে না—রমণীর কথা কেহ শোনে না—তাই আজ মন আবার বলিল—"আমি যখন যার কাছে থাকি তখন তার" তুমি আমাকে স্বইচ্ছায়—নিস্বার্থভাবে—যাহাকে দান করিয়াছ—আমি তার—তোমার আর আমার উপর জোর নাই। এই কথা শুনিয়া আমার রাগ হলো—যে রাগ অন্যকে দুঃখ কষ্ট না দিয়া—অপরের ক্ষতি না করিয়া, নিজের ক্ষতি করিয়া থাকে, মনের কষ্ট দুঃখ মনেতেই চাপিয়া রাখে; অধর ফুলাইয়া, নয়ন ভিজাইয়া, হৃদয় কাঁপাইয়া দুঃখাভিমানের সঙ্গে যে রাগ আসিয়া থাকে, সাধিলে যত্ন দেখালে, আদর করিলে চলিয়া যায়—আর যে রাগ চলিয়া গেলে, ক্ষোভ মনক্লেশ আসিয়া নীরবে কাঁদাইয়া থাকে—প্রখর সূর্য্য-কিরণের পর—নবীন নীরদ হইতে শীতল বর্ষণ হইয়া থাকে—যে রাগ সময়ে সময়ে যুবতীদের আশ্রয় লইয়া অবাধ্য উদ্ধত যুবকদের শাসন করে—উন্নত মস্তক নামাইয়া দেয়—শেষে

সুখের ঘরে নূতন সোহাগের জিনিষ ছড়াইয়া—নূতন আমোদে আমোদিত করিয়া—চলিয়া যায়—সেই রাগ আসিল না।

যে রাগে চুল ছেঁড়ে, মাথা কুটে, সর্পের ন্যায় ফুলিতে থাকে—যে রাগে লোকে অন্ধ ও বধির হয়—যে রাগে লোকের সর্ব্বনাশ হয়—যে রাগ কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক ও চাণ্ডাল ; যে কর্ম্ম সহজে করা যায় না—সেই কার্য্য যে রাগভরে অনায়াসে সাধিত হয়—যে রাগে লোকে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া থাকে—সেই রাগের বশীভূতা হইয়া—ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলাম—"তুই না হস্—আমি স্বাধীন হবো"—এই কথা শুনিবা মাত্র—মন গর্ব্বিত স্বরে—দম্ভ করিয়া বলিল—"এত বড় তেজ, অহঙ্কার যে আমায় ছেড়ে স্বাধীন হতে চাও—এত আস্পর্দ্ধার কথা যে আমার অনভিমতে স্বাধীন হবে—যার শত পুরুষ পরাধীন—যে কখন স্বাধীন নয়—বাল্যে নয়, কিশোরে নয়, যৌবনে নয়, প্রবীনে নয়, বার্দ্ধক্যে নয়—এ জীবনে কখন স্বাধীন নয়—সে আবার স্বাধীন হবে ? আমাকে দুরাশার দুঃখের অধীন রাখিয়া কেমন করে তুমি সুখাশায় স্বাধীন হবে ? আমার চেতনা হলো—ভাবিলাম কি দুর্ব্বুদ্ধি !!! মন না স্বাধীন হলে কি সে স্বাধীন হবো—স্বাধীন ইচ্ছা মনে না উদয় হলে—স্বাধীনতা লাভ

হয় না—তখন বিনীতভাবে কাতর বাক্যে—অনু-নয় করে মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—স্বাধীন হইবার কি তবে উপায় নাই? এ দুঃখ জ্বালা নিবারণের কি কোন পথ নাই? অভাগিনীর হতভাগ্যে কি সুখ নাই? দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া তখন মন বলিল—"একতাই ইহার একমাত্র উপায় ও পথ" তার সঙ্গে এক হইলেই বিনা ক্লেশে স্বাধীন হবে—সকল জ্বালা জুড়াইবে—সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইবে—তখনই ভাল-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইল, যে একতা বিনা স্বাধীনতা পরম ধন লাভ হয় না—একতাই সর্ব্বার্থ সার—সেই একতা নষ্টকারী অর্থ—"কেহ কাহারও নয়" এ জগৎ সংসারের জন্য নহে।

মনের মিলনের নামই প্রকৃত একতা—সেই মিলন আমাদের কি আর আছে!!! হায়, হায়, হায়, তা থাকিলে আর ভাবনা কি?—অভাব কি?—দুঃখ কষ্ট কি? ভাল! আমাদের যদি মনের মিলন নাই, তবে আমার মন আজ তার কাছে কেন? সুখ-লালসায় তার কাছে যে সুখের জন্য নিখিল জগৎ সংসার ব্যস্ত—যে সুখ লাভের জন্য মানব-জীবন কণ্টক পথে ছুটিতেছে—রত্নাকরে ডুবিতেছে—বিজন বনে চলিতেছে—সংসারচক্রে ঘুরিতেছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-দির ভার বহিতেছে, প্রবাসী হইতেছে, সুখের পথের

বিঘ্ন ভাবিয়া—আশ্রিতাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের 'পাদ লেহন করিতেছে—মুখে মুখে থাকিয়া মন জোগাই-তেছে—সেই সুখাশায় আমার মন আজ তার কাছে, কষ্টের শান্তি হবে—এই ভরসায় তার কাছে—দুঃখ দেখিয়া দয়া হবে—এই ভাবিয়া তার কাছে—কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে আশা ভরসা নিশার স্বপন।—আকাশ-কুসুম হলো, দুঃখের লাঘব হইল না—জ্বলিয়া মরিবার জ্বালাটী গেল না, তবে আর কি ভাবিয়া কি আশা ভর-সায় মন এখন তার কাছে বাঁধা আছে? স্বইচ্ছায় নয় দিয়াছি বলিয়া—দিলুম কেন! লোকে বলে "আপনার মন নাহি দিলে পরের মন কি পাওয়া যায়" তাই—দিয়াছিলাম—সুদের লোভে এখন আসল নষ্ট হ'তে বসিল। মন দিলুম—পেলুম না—তবে আমার মন আজ ফিরাইয়া চাহিব। না চাহিলে কেহ কিছু পায় না—বিপন্ন সাহায্য না চাহিলে পায় না—ভিখারিণী ভিক্ষা না চাহিলে পায় না—প্রেম না চাহিলে, যাচিয়া সাদরে কেহ প্রণয় উপহার দেয় না—আর মহাজন খাতকের নিকট না চাহিলে সহজে সুদ আসল সমস্ত পায় না। আজ আমি আমার খাতকের নিকট সুদ না পাই, আসল ফিরাইয়া চাহিব। সুদই বা না পাইব কেন? তিনি আইনজ্ঞ, বলিবেন গচ্ছিতের সুদ চলে না তাই ভাল—আসল সমস্ত ষোল আনা মন আদায়

করিতে তাগাদা করিব; আবশ্যক মতে জোর তলব দিব —আর জোরে কাজ নাই—জোর করিবার দিন গিয়েছে—প্রবল শীত অগ্নির তেজ হরণ করিয়াছে—প্রাণের পাখী প্রেম শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়াছে—সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে—জোর এখন আর খাটিবে না—তাই স্থির করিয়াছি ভাল মিষ্টি করিয়া বিনয় বচনে চাহিব।

হা ভগবন্! কতবার চক্ষের জল ফেলিয়া, বক্ষের দীর্ঘনিশ্বাস দেখাইয়া—কপালে করাঘাত করিয়া—অনিমেষ লোচনে সেই অমিয় মুখখানি পানে চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়াছি—সে দেয় কই—দিলে আমার দুঃখ যাতনা বিদূরিত হইত—আমার যাতনা গেল না,—তাই জানিলাম সে ফিরাইয়া দিল না; কৌশলে আমার মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল—ইহাকে "মনের মিলন" বলে না। দুইটীতে মিশিয়া এক না হইলে "মিলন" হয় না—দুই নদীর বেগ এক স্থানে না মিশিলে মিল হয় না—ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বারি এক স্থানে আসিয়া না মিশিলে মিলন হয় না—স্থানে স্থানের মেঘ এক না হইলে, ডালে ডালে এক না হইলে, মনে মনে এক না হইলে, মেলে না; তাই বলি ইহাকে মনের মিলন বলে না—ইহা একটী নরক যাতনার অধীনতা; অযত্ন করুক, মনে বেদনা দিক্, না দেখুক, চক্ষের শূল বলিয়া ভাবুক—তবু

এ মন তাঁর অধীন—তাই বলি এ অধীনতায় সুখ নাই; নির্দ্দয় স্বার্থপর প্রভুর অধীনতায় সুখ নাই—অবিচারী পক্ষপাতী রাজার অধীনে বাস করায় সুখ নাই—অসৎ বন্ধুর, কুপ্রবৃত্তির অধীনতায় সুখ নাই। কোনরূপ অধীনতাতে কি সুখ আছে?—আছে বই কি। যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার নিয়মাধীন—যাঁর অধীনতা স্বাধীনেরও প্রার্থনীয় —তাঁহার অধীনতায় অনন্ত শান্তি, অক্ষয় সুখ আছে; যে আমাকে কুপথ হইতে, কুকার্য্য থেকে ফিরাইতে, চেষ্টা ও যত্ন করে, এমন ধার্ম্মিক সুহৃদের সদিচ্ছার অধীনতায় শুভ ও মঙ্গল আছে—পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রেমাধীনতায় অতুল আনন্দ আছে—আর আর যাঁকে ভালবাসা যায়, যাঁর করে কুল শীল, জীবন যৌবন এ জন্মের মতন সঁপিতে হয়—যাঁকে এ জীবনে আমার ভাবি—সে যদি চিরদিন আমারই থাকে—তাঁর পদানত থাকিলে মর্ত্ত্যে স্বর্গ সুখ লাভ হয়।

অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতার মূলভিত্তি—স্বাধীনতার মুক্তিপদ পাইবার, পূর্ব্বে প্রেম ভক্তির অধীনতানিগড় অগ্রে স্বইচ্ছায় পরিতে হয়। এ সংসারে যে আপনাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া, নিজ দেহ জীবনাদি পরের অধীন করিতে পারে—সেই প্রকৃত স্বাধীন। প্রকৃত অধীনতার সার মর্ম্ম না গ্রহণ করিয়া, জগতের

অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ স্বাধীনতা লইয়া মানব জাতির মধ্যে কি প্রবল দাবানল মধ্যে২ জ্বলিয়া থাকে। প্রকৃত স্বাধীনতার কোমল শৃঙ্খল—ত্যাগ স্বীকার, আত্মোৎসর্গ নিস্বার্থপরতা, ক্ষমাদি যে পর্য্যন্ত এ জগতে সকলে না পরিতে শিখিবে ও অভ্যাস করিবে, সেই পর্য্যন্ত জগৎ হইতে শান্তির মধুর ভাব অন্তর্হিত থাকিবে।

ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে সুখের আকরই অধীনতা। অধীন না হইলে সুখ পাওয়া যায় না। মানব জাতি সমাজের অধীন না হইলে সুখ পায় না—ধার্ম্মিক ধর্ম্মের, প্রেমিক প্রণয়ের, ভাবুক ভাবের, কবি কল্পনার অধীন না হইলে সুখ পায় না। একা সুখের আস্বাদন পাওয়া যায় না—সুখ অন্যের উপর নির্ভর করে—তাই বায়ুর সাহায্যেই নদীবক্ষে তরঙ্গ আনন্দে ভাসিয়া থাকে, ফুল কুল নাচিয়া থাকে, লতা দুলিয়া থাকে—মেঘের কোলেই চঞ্চলার খেলা ভাল দেখায়—দিবাকরের কক্ষেই বসুন্ধরা জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া থাকে—তাই বলি একা সুখ পাওয়া যায় না। আমার সুখ ব্যগ্রভাবে দেখিবার, সুখের সংবাদ মনোযোগের সহিত শুনিবার, সুখে সুখী হইবার লোক না পাইলে সম্পূর্ণরূপে সুখ পাওয়া যায় না। যখন দুঃখভারে তলাইয়া যাই, আমার সঙ্গে তলাইতে যদি লোক পাই,—দুঃখ সাগরে তুলিয়া ধরিবার যদি সুহৃদ্ পাই—আমার সঙ্গে কাঁদি-

বার যদি বন্ধু পাই,—তাহ'লে সেই দুঃখ সাগরে রত্ন মেলার সুখ হয়—নিবিড় ঘনান্ধকারে সৌদামিনীর আলো দেখিতে পাই—হিমানী-সিক্ত মুদিত অরবিন্দের নীরনিমগ্ন মুখখানি দেখিতে পাই—তাই বলি সুখের আকরই স্বাধীনতা।

কিন্তু তাব'লে সব অধীনতাতে সুখ নাই—শান্তি নাই—সকল কুসুম সৌরভময় হয় না—সকল বৃক্ষ ছায়া দান করে না—সকল মেঘে জলবর্ষণ হয় না—তাই বুঝি সকল রকম অধীনতাতে সুখ নাই।

অধীনতা দুই রকম, সুখের ও দুঃখের; আমি দুঃখের অধীনতাপাশেই আবদ্ধ; তাই স্বাধীন হইতে চাই—তাই সুখের অধীনতা বা স্বাধীনতা বিবাদী অর্থ "কেহ কাহার নয়" এইটীকে প্রবঞ্চনার কথা বলি—সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী না পাইবার কথা বলি—এই কথাই অবনতির কারণ—এ কথায় কে ভোলে—যে ভোলে—সেই ঠকে।

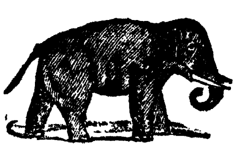

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

—)ঃ০ঃ(—

ভূমিমাত্রেই যেরূপ বীজ অঙ্কুরিত হয়, মানব হৃদয় মাত্রেই তদ্রূপ প্রেম জন্মিয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরতা-গুণের তারতম্য অনুসারে অঙ্কুর যেমন সতেজ বা নিস্তেজভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ফলবান্ বা ফলহীন হইয়া থাকে; তদ্রূপ প্রেম পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়ে, ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকে যথা রূপোন্মাদ, যৌবন-সুলভ মনবিকার গুণাকর্ষণ. আসক্তি, স্বার্থপরতার যত্ন ও দয়া, প্রবৃত্তি বা রুচি বিকার। এক ভূমির রস বৃক্ষ বা লতা বিশেষে, যেরূপ মধুর, অম্লমধুর, কটু তিক্তাদি রসে পরিণত হইয়া থাকে—সেইরূপ এক প্রেম—ব্যক্তিগত স্বভাব, হৃদয়, প্রবৃত্তি কি রুচিভেদে নানা প্রকার আস্বাদনের আধার হইয়া থাকে। ইহারা কেহই প্রকৃত প্রেমপদবাচ্য নহে।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি "ভিন্ন রুচি হি লোক"—দেখিতে পাওয়া যায়। রুচি কি? দ্রব্য বস্তু বা বিষয় বিশেষকে—পাইতে, দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে বা ভোগ করিতে যে ইচ্ছা, স্পৃহা, আনন্দ, আসক্তি বা প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তাহাকে রুচি

গলে। এই রুচি প্রভেদের কারণ নির্দ্দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন শিক্ষা অবস্থা বা বয়োভেদে রুচিভেদ জন্মিয়া থাকে—এজন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনি ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ মধ্যে রুচির বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়—এই কারণেই বাল্যে যাহা ভাল লাগে—কিশোরে তাহা ভাল লাগে না; কিশোরে যা ভাল লাগে, যৌবনে তা লাগে না—আবার যৌবনের যাহা প্রিয় বার্দ্ধকের তাহা অপ্রিয় হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন স্বাদ গ্রহণের শক্তি ও সামর্থ্য সংসর্গ ও অভ্যাস হেতু রুচির বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে—তদ্ধেতু কেহ চিকিৎসা বিদ্যায়, কেহ সঙ্গীত বিদ্যায়, কেহ গণিত বিদ্যায়, কেহ সাহিত্যে, কেহ চিত্রকার্য্যে রুচি ও নিপুণতা দেখাইয়া থাকে। অভ্যাস ও সংসর্গ হেতু কেহ বিদ্যাচর্চ্চা করিতে, কেহ খেলা করিতে, কেহ ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে, কেহ সঙ্গীত আলোচনা করিতে, কেহ পাঁচ জনের সঙ্গে মিশিতে, কেহ একা থাকিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিভেদে রুচিভেদ জন্মিয়া থাকে—এজন্য কাহার হৃদয় করুণারসাত্মক গীতিবাদ্য অভিনয়াদি দর্শনে গলিয়া যায়, কাহার বীররসাত্মক বাক্যে হৃদয় উদ্বেলিত হয়, ভক্তিরসের অবতারণায়

কাহার চিত্ত গদগদ, নয়ন সজল হইয়া থাকে, আদি রসের তরঙ্গে কাহার হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠে। কোন বালক ঘোর কাল মেঘমণ্ডিত আকাশের বিদ্যুদ্দমে আনন্দে একা বসিয়া দেখিতে পারে, আর কেহ সামান্য শব্দে চম্‌কাইয়া মাতার ক্রোড়ে পালাইয়া যায়।

সেকেন্দর সাহা বাদসাহা বাল্যকালে অস্ত্রের ঝন্‌-ঝনা শব্দে, হয় হস্তীর গর্জ্জনে ভীত না হইয়া পুলকিত হইতেন। সাগর বক্ষের উত্তাল তরঙ্গের খেলা—অট্ট-হাসি দেখিয়া কেহ পুলকিত হয়, কেহ বা ভীত হয়। এজন্যই কেহ বিরাট সৌন্দর্য্য ভালবাসে, আর কেহ সুকুমার সৌন্দর্য্যের প্রিয়, কেহ প্রমোদ কাননের কমনীয় শোভাদর্শনের অভিলাষী হয়, আর কেহ গিরি পর্ব্বত, নদ নদী, সাগর মহারণ্যের ভয়ঙ্কর শোভাদর্শনে লোলুপ। তিনি এখন হিমানী শক্তি মৃতপ্রায় কম-লিনীর শোভা—প্রভাত-শিশির-সিঞ্চিতা মসিনা লতার রূপ দেখিতে ভাল বাসেন—তাঁহার সে পূর্ব্বের রুচি, প্রবৃত্তি সব পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তাই বলি পরিবর্ত্তনশীল মনের প্রবণাদি কেহই প্রকৃত ভালবাসা নহে—তাই আজ যাহা পরম উপাদেয়, কাল তাহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত অসহ্য—আজ যাহা রত্ন, কাল তাহা ঘৃণিত দ্রব্য—আজ যাহা যত্নের ধন, আদরের সামগ্রী, কাল তাহা অয-ত্নের ও অনাদরের বস্তু—আজ যে স্থান পবিত্র, কাল

তাহা অপবিত্র—তাই বলি প্রকৃত প্রেম এক পৃথক রত্ন। ইহার সহিত মনোবিকার, রূপোন্মাদ, গুণাকর্ষণের সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই—বিকার কাটিলেই মন প্রকৃতিস্থ হয়—রূপের সঙ্গে বা তৃপ্তি সাধনে উন্মত্ততা তিরোহিত হয়। প্রাচীন কবিরা বলিয়াছেন, অপ্রিয় ব্যক্তির গুণ দোষ এবং প্রিয় ব্যক্তির দোষ গুণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়—হিমাংশুর জগত-স্নিগ্ধকর শীতল কিরণ সরোজিনীর গাত্রে বিষ ছড়াইয়া দেয়; কিন্তু তপনের প্রচণ্ড আতপে, তিনি প্রস্ফুটিতা হইয়া হাসিতে থাকেন। আজ যে স্বর অন্যের কর্ণে কর্কশ—তাহা আমার কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দেয়, তাই বলি—রূপগুণের আকর্ষণ প্রকৃত ভালবাসা নহে।

দয়া আর ভালবাসা দুইটী পৃথক বস্তু। আমরা অন্ধ আতুরকে, দীন দুঃখীকে, স্মরণাগত বিপন্নকে দয়া করিতে পারি, যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারি তাহাদের জন্য কাঁদিতে পারি কিন্তু ভালবাসিতে পারি না—হৃদয়ের গুঢ় প্রদেশে স্থান দিতে পারি না—দয়ার পাত্রের সহিত প্রাণ সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক হইতে পারে না—মধ্যে কি যেন একটী ব্যবধান আছে বলিয়া অনুমিত হয়। তখনই বলি এ দুঃখিনীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতে পারে কিন্তু ভালবাসা আর আসিতে বা জন্মাইতে পারে না।

তাই দুঃখে বলি তাহার এ দয়া আমি চাইঁ না—প্রেমাভিমানিনী হইয়া বলি এ জীবনে তাহার দয়া ভিক্ষা করিতে পা'রিব না। কতবার ভাবিয়া দেখিয়াছি—জগতের সকল বস্তুই সু কু মিশ্রিত ; অভিমান জগতের বস্তু সুতরাং ইহাতেও ভাল মন্দ দুই—আছে।

কু-অভিমান পরপীড়ন করে—পরের মর্ম্মে আঘাত দেয় ইহাতে কোমলতার ছায়ামাত্র নাই। গর্ব্বগঠিত এ অভিমান সদ্ভাবের শাসন, অন্যের উপদেশ, পরের স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে পারে না। এই দুরভিমানীর সহবাস অসহ্য, কথা বিষময়, তেজ অসহ্য, আকৃতি ও ব্যবহার ঘৃণাদায়ক সুতরাং ইহারা সাধারণের বিরাগ ভাজন হইয়া থাকেন। এই অভিমানের নিকট হইতে সুখশান্তি পলায়ন করে, দয়া ধর্ম্ম স্থান পায় না, মায়া মমতা অগ্রসর হইতে পারে না ; এই জন্যই কবিগণ দেবাসুরের ললাটে, আকৃতি সহ প্রকৃতি মিলিবে বলিয়া, এই অভিমানকে বসাইয়া দিয়াছেন। ইহা প্রকৃত অভিমানের বিকার মাত্র। রূপের—ধনের—বলের অভিমানে তেজ ও গর্ব্বে ফাটিয়া পড়া, উন্মত্ত হওয়া, ধরাকে সরা জ্ঞান করা, সহ-পূর্ব্বোক্ত অভিমানের সহিত ঘনিষ্ট সংস্রব না থাকিলেও কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে—এজন্য ইহারাও যথার্থ অভিমানের একরূপ বিকার ভাবাপন্ন বলিতে হয়। পর-প্রেম-

কাঙ্গালিনীর নিকট এ অভিমান থাকিতে পারে না—পরমুখাপেক্ষী দুঃখিনীর কাতর হৃদয়ে এ অভিমানের স্থান নাই।

সু অভিমান, মান ও গৌরবে গঠিত হইয়া থাকে। ইহা সরোবর-স্বচ্ছনীর-প্রতিহত ভাস্করের প্রতিবিম্বের ন্যায় তেজময় অথচ নয়নের অসহনীয় নহে—ইহা অন্যকে পীড়া না দিয়া আত্মরক্ষা করে—ক্ষুদ্রান্তঃকরণোপযোগী নীচ ও ঘৃণিত কার্য্য হইতে মনকে ফিরাইয়া লয়। এই অভিমান আপদ কালে বন্ধুর ন্যায়, অবৈধ কার্য্যকালে প্রহরীর ন্যায়, সাবধান ও সতর্ক করিয়া থাকে। বিপদকালে ইহার সাহায্যেই মনুষ্যত্ব রক্ষা পায়। এই বিঘ্ন-বাধা-সঙ্কুল সংসার তরঙ্গে এই অভিমানই ভেলার ন্যায় আশ্রয় ও অবলম্বন হইয়া থাকে।

একটী সাধারণ প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে অভিমানী অন্যের মান সহ্য করিতে পারে না—ইহা সম্পূর্ণ অলীক; নীতি মূলক একটী কবিতাতে বলা হইয়াছে ঃ—

"মান্যা ইব হি জানন্তি মানিনামাদরং মহৎ।
শিবমিন্দুং শিরোধত্তে, ত্বমেবর্ত্তি বিধুন্তুদঃ॥"

মানী ব্যক্তি মানীর মান বুঝিতে পারেন তাই মহামানী ভূতনাথ কপালে চন্দ্রকে ধারণ করিয়া থাকেন আর দুর্ব্বৃত্ত রাহু সেই চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে।

গর্ব্বী ভীমসেন, যখন মহারাজ মানী দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে অভিভূত হইয়া, পাটলী পুত্র নগরে যখন রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হন; তখন মান্যবর মানী চাণক্য ভূতলে পড়িয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। লঙ্কাধিপতি রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, যখন রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য নিকটে আহ্বান করেন, তখন জানকীবল্লভ শ্রীরাম বিশেষ সম্মানসূচক ব্যবহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মানীর মানভঙ্গ করা, এক মহাপাপ বলিয়া আর্য্যঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলি, প্রকৃত অভিমানের সহিত মহত্ত্বের অনেকটা সাদৃশ্য থাকে। এ অভিমানে দুর্ব্বলতা, চঞ্চলতা, চাতুরী কিছুই নাই। প্রকৃত অভিমানী অন্ধকারে আঘাত করিতে, অযোগ্য ব্যক্তি সহ প্রতিদ্বন্দীরূপে দণ্ডায়মান হইতে—অজ্ঞাতে গোপনে আক্রমণ করিতে, পরশ্রীতে বিষণ্ণ হইতে পারে না। যেহেতু, সে আপনাকে এত ক্ষুদ্র, নীচ, অকর্ম্মণ্য, সারশূন্য ভাবিতে পারে না—হঠাৎ ঐরূপ কোন প্রবৃত্তি বলবৎ হইলে, আপনাকে লজ্জিত, অপরাধী ও দোষী বোধে সতর্ক ও সাবধান হয় বলিয়া মনের বেগে বাধা পায়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। তাঁহা-

দের নিকট জগৎ সংসারের সমস্ত পদার্থ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ হয়—তাই কথায় বলে "যাক প্রাণ, থাক মান"।

প্রকৃত অভিমান মানবের অমূল্য আভরণ। বিনয়াবনত অভিমান সম্পদ কালে সুবর্ণ-মণ্ডিত-হীরকখণ্ডের ন্যায় অধিক উজ্জ্বল হইয়া থাকে বটে—কিন্তু বিপদকালে ইহা হইতেই হীরকের বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়—তাই সম্পদ কালের প্রণয় সম্ভাষণ, গুণ কীর্ত্তন ও ভালবাসার নিদর্শন বা উপচয় বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে—আর দুরাবস্থা কালের গুণানুবাদ চাটুবাদে পরিণত হইতে দেখা যায়। নিস্বার্থ ভাবের প্রেমোচ্ছ্বাস দুঃসময়ে স্বার্থপরতার বাগাড়ম্বর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইতে পারে—তাই বুঝি দুঃসময়ের বিনয়াবত অভিমান—সময়ে সময়ে স্থল বিশেষে দুঃখ কষ্টের আধার হইতে পারে। ভাগ্য বৈগুণ্যের দুর্ব্বিসহ ভার বহিবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য এই সদভিমান বলে লাভ হইয়া থাকে—তাই অভিমানী নিজে পথভিখারী হয়—তবু অন্যকে ঠকাইতে পারে না, নিজ সুখের জন্য অন্যকে কষ্ট দিতে চায় না—বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে অন্যের তোষামোদ করিতে পারে না। যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি দুঃখ দেখিয়া দুঃখিতা হইবেন না—কান্না দেখিয়া কাঁদিবেন না—তাঁহার সম্মুখে মনের দৌর্ব্বল্য দেখা-

হইতে চাহে না—যাহা পাইবার অধিকারী তাহার জন্য যাচ্ঞা করিতে পারি না। প্রেমের পাত্রী হইয়া আজ দয়ার পাত্রী হইতে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তাই প্রেমোন্মত্তা অভিমানিনী হইয়া বলি—প্রেমের গৌরব রক্ষার জন্য বলি—আমি কেবল তাঁহার দয়ার ভিখারিনী হইতে পারিব না। মরিব তবু মর্য্যাদায় হারিব না।

অনেক বিচক্ষণ দূরদর্শী পণ্ডিত বলিয়া থাকেন—অগ্রে আসক্তি, পরে অনঙ্গলিপ্সা, পরে সংস্রব বা সহবাস—ক্রমে ভালবাসা বা প্রেম—ইহা সত্য হইলেও যাহা হইতে যেটী জন্মায়—সেটী, সেই বা তদ্রূপ বস্তু হইতে পারে না—পঙ্কিল কর্দ্দম ও পঙ্কজ এক বস্তু নহে—শুক্তি হইতে মুক্তার জন্ম হয় বলিয়া, শুক্তি ও মুক্তা অভিন্নভাবাপন্ন এক পদার্থ নহে।

ইহারা কেহই আত্ম বিসর্জ্জনের পথেও যায় না, সর্ব্বদা ভোগ বিলাসে নিরত থাকে—আত্মসুখাশা তৃপ্তির জন্য চেষ্টিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটী াগমের ভরা নদীর ন্যায়, কুলপূর্ণ করিয়া কিছু দিনের জন্য বহিয়া থাকে; আর কোনটী বিদ্যুদ্দামের মতন চক্ষু ঝলসিয়া, সকল স্থান আলোকিত করিয়া দর্শককে গাঢ়তর অন্ধকারে ফেলিয়া যায়। ইন্দ্রিয়চরিতার্থ লালসা ও আত্মসুখান্বেষণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি,

ইন্দ্রিয় সুখভোগে রক্ত মাংসের সহিত বর্দ্ধিত, তৃপ্তি সাধনেই সমাপ্তি। আর কোথায় বা শেষে উপেক্ষা, বিরক্তি ও ঘৃণাদিতে পরিণত হইয়া থাকে। প্রকৃত ভালবাসায় ইহাদের সকল ভাল ভাব আছে, মন্দ ভাব নাই; দয়ার সহৃদয়তা ব্যাকুলতা আছে, বিরক্তি উপেক্ষা বা ঘৃণারি ভাব নাই—কামাদি প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস আছে, আবিলতা নাই। ইহাতে দান আছে উপযুক্ত প্রতিগ্রহ নাই; কোমলতা আছে, নিরসতা নাই —রূপ গুণের মোহ আছে, তুলনা নাই; কবি নিধু-বাবুর একটী গান এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহী মণ্ডলে।
গগণে শারদ শশি উদয় কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে গৌরবে, কে তব সদৃশ হবে,
অন্যেতে নাহি সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গা জলে॥"

ব্রজেশ্বরী প্রেমিকা রাধিকা বলিয়াছেন, "আমার নয়ন লয়ে হের যদি তারে, হেরিলে সে রূপ কাল সব দুঃখ যাবে দূরে" তাই বলি প্রেমের তুলনা নাই। প্রেমের পাত্রের যতটুকু রূপ গুণ আছে—তাহাই চরমোৎকর্ষতা বলিয়া জ্ঞান হয়। তদপেক্ষা অধিক রূপ গুণ অন্যে থাকিলেও চক্ষে লক্ষিত হয় না, হৃদয়ে

ধারণা হয় না। এই জন্যই কোন কোন কবি ভাল-বাসাকে অন্ধ বলিয়া থাকেন।

ইহাতে সুখ দুঃখ, অমৃত বিষ, লাভ ক্ষতি, দিবা রাত্রি কিছুই নাই। প্রকৃত ভালবাসা নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও নিরন্দ্রিয়—ইহার তৃপ্তি সাধন হয় না—দান করিয়া সাধ মেটে না, প্রতিগ্রহে আকাঙ্ক্ষা ফুরায় না। ইহাতে অতৃপ্তিকর ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা, প্রবল মত্ততা, প্রচণ্ড হৃদয়বেগ বিদ্যমান থাকে, এজন্য এক প্রকার মধুর যাতনা, সুখের কষ্ট আসিয়া থাকে।

অমৃত সহ গরল এমন এক হইয়া মিশিয়া থাকিতে এ জগতে আর কিছুতেই দেখা যায় না। কোন মহা কবি (সেক্ষপীয়ার) প্রেমিক, কবি ও পাগলকে এক শ্রেণীভূক্ত করিয়াছেন। প্রেমিক প্রেমের আধারকে —কবি প্রকৃতি দেবী, কল্পনা সুন্দরীকে—আর পাগল বা পাগলিনী নিজের ভাবকে ভাল বাসে। ভাষাতে ভালবাসার ন্যায় অমিয় ভাল ভাষা আর নাই, এমন মধুর কথা আর নাই।

ভালবাসায় কোন প্রশ্নের নিয়মিত প্রত্যুত্তর দেওয়া যায় না। কেন ভালবাসি ?—কি সে ভালবাসি—ভাল-বাসার কি সুখ? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর নাই। যে উত্তর দিতে পারিবে সে ভালবাসিবে কেন ? তার ভাল বাসাই বা কি ? মাতালে মদ খাইয়া মত্তার সুখ

বুঝিতে বলিবে—প্রেমিকে প্রেম করিয়া ইহার উত্তর জানিতে বলিবে—এ ভিন্ন অন্য উপায় নাই—ভাষায় এ সুখ জানাইবার কথা নাই, অঙ্গভঙ্গির দ্বারায় কি আঁকিয়া দেখাইবার ক্ষমতা নাই।

পবিত্র প্রেম—আত্ম সুখ দুঃখ ভুলিয়া যায়—জগৎ সংসারকে এমন কি আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়—দুঃখে কষ্টে এ প্রেম দৃঢ়ীভূত হয়, অদর্শনে হ্রাস না হইয়া বরঞ্চ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই প্রেম অনাদরে কম্পিত, প্রলোভনে বিচলিত, কালস্রোতে স্থানচ্যুত কি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। নদীর স্রোত সাগর-সঙ্গমে প্রশমিত হয়—প্রণয় স্রোতের কিছুতেই বিরাম নাই, চিরদিন বহিতে থাকে। প্রেমের পাত্র চক্ষের অন্তর হয়, হৃদয়ের অন্তর হইতে পারে না; প্রেমিকের সৌন্দর্য্য যায়—হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্যো-ন্মাদ যায় না—দেহ চলিয়া যায়, দেহের ছায়া বাহিরে ভিতরে পড়িয়া থাকে। এই প্রেমে এক বস্তুই প্রতি-ক্ষণ নূতন বলিয়া ভ্রম হয়—প্রেমের হাটে কোন জিনিষ শুষ্ক হইতে পারে না, কোন দ্রব্য পুরাতন হয় না—প্রেম-মাখান কাল দ্রব্য সুন্দর হইয়া থাকে; প্রকৃত প্রেমিক নিত্য নূতন আদর, সোহাগ, সুখ, আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। যে হৃদয়ে পবিত্র প্রেম বিরাজ করে, সে অন্য হৃদয়কে আপনার সঙ্গে

মিলাইয়া এক করিতে পারে, অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে। সমুদ্রের জল উথলিয়াই নদ নদী সহ এক হইয়া থাকে—তড়াগ হ্রদাদিতে প্রবেশ করিয়া থাকে।

পবিত্র প্রেম, স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়, এক বস্তুর উপর চিত্ত ও মনকে স্থাপিত করিতে অভ্যাস করায় এবং অন্য সব ভুলিয়া—স্থির ভাবে একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা দিয়া—মনকে ক্রমশঃ প্রসারিত, উন্নত ও ভাবগ্রাহী করিয়া তোলে। হৃদয় নিহিত এই জগৎদুর্ল্লভ প্রেম সামান্য মানবকে দেবতা করে—তাই বলি—

প্রেম স্বর্গীয় রত্ন—দেবগণের আদরের ধন—ব্রজ গোপিনীরা এই রত্নের জন্য কাঙ্গালিনী—ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা প্রেমের জন্য কলঙ্কিনী—দেবী সুভদ্রা এই প্রেমের দায়ে লজ্জাহীনা—মহাযোগী ভূত-নাথ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পাগল, ভোলানাথও ভিখারী। ত্রিদিব পূজিত প্রেম রত্নাগারে "কে কার, কেহ কাহারও নয়" এ অর্থ নাই।

এই বিস্তীর্ণ জগতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিতে পারেন নির্ধনী বলিতে পারেন—অর্থ না থাকিলে কে কার? স্বার্থপর ব্যক্তি বলিবেন, বিনা স্বার্থে কে কার? স্বাধীন বীরহৃদয় বলিবে, অধীন

থাকিতে চাহে কে কার? মানী বলিবে—অপমান সহ্য করে কে কার? শোক কাতর হৃদয় বলিবে—চক্ষু মুদিলে কে কার? কিন্তু ঐ সকল অর্থ আমার মনের সঙ্গে মেলে না—বিনা স্বার্থে, দুঃখ কষ্ট সহিয়া—এ জীবনে আমি তার চির প্রেমাধীনা দাসী। যে দিন তাঁহারে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; হৃদয় কপাট মুক্ত করিয়া মন আসনে সেই মোহন মূর্ত্তি বসাইয়া, প্রেম চক্ষে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছি—সেই দিনই এই ছার প্রাণ রাঙ্গাপায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি।

যে দিন তাহার আদরে সোহাগে গলিয়া গিয়াছি—নিকটে বসিয়া আত্মহারা হইয়াছি—সেই দিনেই জানিয়াছি এ দেহ, এ জীবন থাকিতে আমি তার চরণাশ্রিতা কিঙ্করী—তাই বলি "কে কার, কেহ কাহারও নয়" এ কথা আমার প্রাণের সঙ্গে মেলে কই—মনের সঙ্গে খাটে কই? প্রণয়ীর হৃদয়ে এ কথার স্থান কই? প্রেম পুস্তকে এ কথার আভাস কই? তবে প্রেমাধীনা আজি পাগলিনী কেন? ভাগ্যদোষেই সু আজ কু হইল—অমৃতময় প্রেমই আজ গরল হইয়া আমাকে উন্মাদিনী করিল। এই প্রণয় বাঁধে লাগিয়া, আমার আশা, সুখ, শান্তি, প্রফুল্লতা, উৎসাহ সব ভাঙ্গিয়া গেল। এ বাঁধ না থাকিলে জগতে বিচ্ছেদ, দুঃখ, খেদ, ভয়, জ্বালাদি কিছুই থাকিত না—দগ্ধ হৃদয় এত

হায় হায় করিত না, পোড়া নয়ন হইতে এত উত্তপ্ত বারি পড়িত না—তাই বলি সেই বাধা না থাকিলে ভালই হইত—পরের ধন পরের লইতে ইচ্ছা থাকিত না—তিনি আমায় ভুলিয়া অন্য কাহারও হইতেন না; আমার পদে অভিষিক্তা হইয়া আর কেহ সে সুখভাগিনী হইতে পারিত না—তাই ভাবি প্রণয় বাঁধ না থাকিলে মঙ্গল হইত। হৃদয় প্রবাহ সমতল পথে চারিদিকে বহিয়া যাইত—হৃদয়কন্দর জলপূর্ণ ভারে ভারী হইয়া থাকিত না। প্রাণের ভালবাসা প্রাণের সহিত প্রাণী সমূহকে দিয়া তৃপ্ত হইতাম; পাখীর ন্যায়, মনের উল্লাসে বনে বনে বাস করিতাম, ডালে ডালে বসিয়া নির্ভয়ে গান করিতাম—আজ সন্তাপিনী তাপিনী উন্মাদিনী হইতাম না—আর আমার কাতরোক্তিও "উন্মাদিনীর প্রলাপ" হইত না।

পরক্ষণেই আবার ভাবি—যদি প্রণয় বাধ না থাকিত, প্রণয়ে কি আছে জানিতাম না—তাঁর হাঁসিমাখা মুখ দেখিলে আমার হৃদয় কেন নাচিতে থাকে? প্রাণ শিহরিয়া উঠে, অঙ্গ কণ্টকিত হয়—আমার চতুর্দিকে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দেয়—চক্ষের সম্মুখে সুখের ঢেউ খেলিতে থাকে—কর্ণরন্ধ্রে, কেন বায়ুর সুমধুর শব্দ নিনাদিত হয়, এ সব জানিতে পারিতাম না—প্রণয়ে কত সুখ তাহা বুঝিতাম না। প্রণয় বাঁধের দোষ নাই

আমার সময় ও ভাগ্যের দোষ। প্রণয় বাঁধ না থাকিলে জগৎ চলিত না। প্রণয়ই একতার প্রধান ভিত্তি। জাতিতে জাতিতে মিলন রাখ, দেশে দেশে এক হও, পরস্পরে প্রণয় কর, ভাই ভাই সহানুভূতি রাখ— বিবাদ মিটাও, কলহ ত্যাগ কর, পূর্ব্ব কথা ছাড়িয়া দাও, অভিমান ত্যাগ কর, অপমান ভুলিয়া যাও, মাপ চাও, ক্ষমা কর,—এ সকল প্রণয় সংস্থাপনের পথাবলী। প্রণয়েই পর আপনার হয়, পরের বিপদে পরে মাথা দেয়, একের জন্য অন্যে কাঁদে; তাই দেখি প্রণয় জন্য সমস্ত সংসার লালায়িত—তাই বলি প্রণয়কে ত্যাগ করিয়া জগৎ থাকিতে পারে না।

প্রেম—দেহের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া থাকে তা লোকে বলে যদি বুক চিরে দেখাইবার উপায় থাকিত তা হ'লে "দেখাইতাম আমি তোমায় কত ভাল বাসি"। প্রণয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে জানাইবার, বুঝাই-বার কথা কোন ভাষাতেই নাই—ভালবাসা সব বলা যায় না, লেখা যায় না, পটে আঁকা যায় না। প্রাণের ভালবাসা মনই বুঝিতে পারে, তাই হৃদয় ও অধর কাঁপিয়া থাকে, মন বিচলিত হয়, ও সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়। এই ভালবাসাই মানুষকে পাগল করে; ইহার প্রখর স্রোতে লজ্জা, মান, ধৈর্য্যাদি সব ভাসিয়া যায়— কেমন ভয়ানক একটান, প্রবল আকর্ষণী শক্তি যে

অনিচ্ছা স্বত্বেও পাকে টানিয়া আনিয়া ফেলে। প্রণয়ের হাত হইতে কোনখানেই নিস্তার নাই—ঘরে থাক, পরিবারবর্গকে ভাল বাসিবে, সমাজে থাক সমাজকে ভাল বাসিবে, যোগী হও যোগকে ভাল বাসিবে, অরণ্যবাসী হও—নির্জ্জন বনে যাও পশু পক্ষী ফুল ফল, লতা পাতাদিকে ভালবাসিবে, এই কারনেই তপস্বীরা লতার সহিত তরুগণের বিবাহ দিতেন হরিণশিশুটীকে প্রতিপালন করিতেন—শুক পাখিকে যত্ন করিতেন। এই জন্যই আশ্রমপশু বধ করা নিষেধ আছে—তাই বলি ভালবাসা জগৎ সংসারকে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছেন—ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই।—ইহার পীড়ন হইতে পরিত্রাণ নাই—কিন্তু নিতান্ত অনুতাপের বিষয় এই যে, জগতে বিশুদ্ধ প্রণয় কই, সর্ব্বসাধারণে সচরাচর ইহা লক্ষিত হয় কই! তা' হইলে আজ বিজেতা বিজিত মধ্যে এত প্রভেদ দেখা যাইত না—দ্বেষ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি সমাজে এত বলবতী থাকিত না—প্রবঞ্চনা প্রতারণা চাতুরী ছলনা মানবের এত অভ্যাস হইত না—আর ইতিপূর্ব্বে যাহার জন্য তিনি প্রাণ দিতেও বিমুখ ছিলেন না আজ তাহাকে ভুলিতে পারিতেন না।

তাই ভাবি বড় সাধের "প্রণয়" আমার ভাগ্যগুণে

প্রলয় হইয়া দাঁড়াইল—ভাগ্যগুণে বলি কেন? তাঁমার বুঝিবার দোষে, ভাল, মন্দ বলিয়া অনুমিত হইতেছে, দেখিবার ক্রটীতে উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল, বোধ হইতেছে। স্বার্থহীন ভালবাসা, নিষ্কাম প্রণয় আমার হৃদয়ে কই—যদি তা থাকিত সে যা করে, যা পেয়ে. যা নিয়ে, যে ভাবে ভাল থাকে সুখ পায়—তাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিতাম আর—আর—আর—

"আমার যাতনা যত কভু না জানাব তায়।"
"পাছে আমার যাতনা শুনে সে আমার যাতনা পায়।"
"সে বাসেনা বাসে ভাল, সে ভাল থাকে সেই ভাল"
"শুনিলে তারি মঙ্গল তাপিত প্রাণ তবু জুড়ায়।"

এই গান গাহিতে২ বনবাসিনী হইতে পারিতাম—তাঁহার সুখের কণ্টক এই জীবনকে জীবনে জলাঞ্জলি দিতাম—"সে আমার সুখে থাকুক এ প্রাণে সকলি সবে" ভাবিয়া নীরবে সব সহ্য করিতে পারিতাম। হা ভগবন্ "সে" এখন "আমার" কই? যখন ছিল, তখন ছিল—তবে আর পোড়ার মুখে বলি কেন যে—'সে আমার'। তাঁর অনুরাগে মত্ত হইয়া, তাঁর বিরহে অন্ধ হইয়া, ভুলিতে না পারিয়া প্রেমামোদে বলি 'সে আমার'। ও হরি! একি কথা সে কি ভুলিবার ধন, ভুলিতে কে চায়—যে ভুলিবে সে তার, তাই বলি 'সে আমার"। ভাল যদি সে আমার—হলো তবে না

হলো কি ? তবে সুখ পাই না কেন ? কিসে পাব ? আমি জানি "সে আমার" তাতে সুখ লাভ হয় না— সে না বলিলে, ব্যবহারে না জানাইলে—দুই'তে এক না হইলে সুখ হয় না—তাই দুঃখ পাই। জগতে বিচ্ছেদ মিলন, রৌদ্র ছায়া, সুখ দুঃখ, উত্তাপ শৈত্য দুই কেন— এক জগতে দুই কেন ? কেবল মিলন ছায়া সুখ শৈত্যতে কি জগৎ চলিত না ? সৃষ্টিকর্ত্তা অনাবশ্যকীয় কোন বস্তুই জগতে সৃষ্টি করেন নাই। কেবল শৈত্যে দেহ রক্ষা হইত না—কেবল ছায়াতে বৃক্ষাদি বাঁচিত না—ফলবানও হইত না। সুখের জন্য দুঃখের আবশ্যকতা আছে—তাই পূর্ণিমার আনন্দ পাইতে অমানিশার প্রয়োজন হইয়া থাকে—শীত জন্য গ্রীষ্মের আদর—আবার গ্রীষ্মের জন্য বারিধারার প্রয়োজন হইয়া থাকে। তৃষ্ণা না পাইলে জলের স্বাদ পাওয়া যায় না—ক্ষুধা না পাইলে আহারের আস্বাদন গ্রহণ করা যায় না—তাই ভাবি সুখের জন্য দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতে বৈচিত্র্যতার প্রয়োজন—তাই বিচিত্রময় সংসারে সকলের আকৃতি প্রকৃতি, রুচি প্রবৃত্তি এক সমান নহে। সকল বিষয়ে সকলে সমান হইলে, সকলেই এক অধিকার পাইবার জন্য লালায়িত হইলে, সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কারণ হইত। এ জগতে বৈচিত্র্য না থাকিলে চাহিবার, দেখিবার, পাই-

বার জন্য চেষ্টা যত্ন, পরিশ্রমাদি কিছুই করিবার প্রয়োজন হইত না। সুন্দর বালক, কমনীয় কুসুম নির্ম্মল নীলাম্বর, দেখিয়া আনন্দ হইত না। দয়ালুর দয়া, বীরের বীরত্ব, গুণীর সৌজন্য, পণ্ডিতের নম্রতা, মূর্খের দাম্ভিকতা, উদারচেতার ক্ষমা, দাতার দান, ইত্যাদি দেখিয়া মনে নানা ভাবের স্রোত বহিত না। জগত সংসারে বিরোধী পদার্থের সৃষ্টি হেতু, ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, আদর অনাদরের পার্থক্য বোধ ঘটিয়া থাকে। জগতে বৈচিত্র আছে বলিয়াই, প্রকৃতির স্তবকে স্তবকে নানারূপ সৌন্দর্য্যের আভা, উচ্ছ্বাস, লহরী তরঙ্গ উঠিয়া খেলিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। পক্ষীর গানে, তটিনীর স্বর সংযুক্ত কল্লোলে, সমুদ্রের উত্তাল রবে, পত্রের মর মর শব্দে, নির্ঝরনীর প্রবাহে, সূর্য্যের তীব্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মে নিশানাথের মধুর কোমলরূপে, বসন্তের ললিত সৌন্দর্য্যে মেঘের গাম্ভীর্য্যে এবং জগতের নানাস্থানের নানা পদার্থে স্নিগ্ধ, মধুর, কোমল, বিমল, শুভ্র কমনীয় উজ্জ্বল, প্রখর ভয়াবহ নানাবিধ সৌন্দর্য্যের ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায়—প্রকৃতি দেবীও সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নানা রকমের বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া থাকেন। যখন জগতের সকল বিষয়েই বৈচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়—বিরহেও তখন বিচিত্রতা থাকা অস্বাভাবিক

নহে—তাই সকল বিরহ কেবল দুঃখ-মৃত্তিকাতে গঠিত ও নিরাশা প্রান্তরে রোপিত হয় না। বিরহ মর্ম্মভেদী, জ্ঞানবিলোপকারী হইলেও—স্থল বিশেষে ইহার মধ্যে—আশার বিদ্যুৎ স্ফুরণ দেখা গিয়া থাকে। কোন কোন বিরহাভ্যন্তরে একটী সুখের ছায়া—আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে—এজন্য কোন কবি বলিয়াছেন ঃ—

"সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহঃ ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুনমপি তন্ময়ম বিরহে॥"

মিলনে সে নিকটে একা থাকে, বিচ্ছেদে সে শত সহস্র হইয়া ত্রিভুবন ব্যাপিয়া থাকে। এই বিরহের প্রকোপে মানময়ী শ্রীমতী রাধিকা—তাঁহার সখিকে বলিয়াছেন—

"যস্যাং যস্যাং দিশি দিশি মুখং মানতোহং নয়ামি
তস্যাং তস্যাং সজল জলদ শ্যামল নন্দ সূনুং"

সখি! যেদিকে চাই—সেই দিকেই কালাচাঁদকে দেখিতে পাই—তাই লোকে ভুগিয়া বলে যে কোন ২ বিরহে—কষ্টের সহিত একটু সুখের আস্বাদন পাওয়া যায়—কিন্তু আমার যে কেমন পঙ্কিল মন, অবোধ হৃদয়, কিছুই বুঝিতে পারি না—আমার পাগল প্রাণের সঙ্গে কবির কথা মেলে না, অন্য বিরহের ভাব খাটে না। তাঁহাকে শয়নে স্বপনে, জাগরণে হৃদয়মন্দিরের চারি-

দিকে দেখিতে পাই বটে—কিন্তু দেখিয়া আর সুখের লেশ মাত্র পাই না। সেই হাঁসি-হাঁসি অমিয় মুখখানি —সেই আমার প্রেমে গলাভাব, আবেশের বিহ্বলতা আর দেখিতে পাই না—তাই সুখ পাই না, তাই বলি— ঐটী কবির কল্পনা-প্রসূত আকাশ কুসুম, স্বর্গের পারিজাত—অপ্সরাক্ষেত্রের প্রমোদ কানন, সুখ স্বপ্নের উচ্ছ্বাস মাত্র। যেমন সমুদ্রের গভীরতার সহিত তরঙ্গের প্রবল ও অপ্রবল গতিশক্তির সংস্রব আছে— সেইরূপ কল্পনার সহিত ভাবের নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। বৃহৎ সরোবর হ্রদাদির গভীরতা থাকিলেও তাহা সীমাবদ্ধ সুতরাং তাহার তরঙ্গের গতিতে তত আবেগ প্রবলতা কি উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয় না। অসীম সাগরের তরঙ্গ লহরীর গর্জ্জনে, তীব্র ভ্রুকুটীতে অটল হৃদয়ও টলিয়া থাকে। উদার বিস্তৃত কবির হৃদয় অসীম রত্নাকর—তাই ইহার কল্পনা, ভাব, সুখ, চিন্তাদি সকলই অপার অবিশ্রান্ত, জীবিত ও প্রবল—তাই বলি ঐ কথা আমার সীমাবদ্ধ, শ্রান্ত, ভগ্ন ও মৃতপ্রায় মন প্রাণের সঙ্গে খাটীতে পারে না। প্রাণহীন দেহ দেখিয়া কষ্ট বাড়ে ভিন্ন কমে না সেইরূপ—সেই পূর্ব্ব ভাব বিশ্লেষিত তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে সুখের তরঙ্গ না খেলিয়া দুঃখ বেগ উছলিয়া উঠে— আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না—অথচ না দেখিয়াও

থাকিতে পারি না ; তাই সভয়ে জিজ্ঞাসা করি দুঃখের এত অধিক সৃষ্টি কেন ? জগতে এত দুঃখ কেন ? দুঃখের এত প্রয়োজন কিসে ? যদি বল সুখের স্বাদ পাইবার জন্য, দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে—দুঃখ না থাকিলে সুখও থাকিত না ; সুখ কি—তাও কেহ জানিত না, অনুভব করিতেও পারিত না—হতে পারে কিন্তু আমি দুঃখতো অনেক ভুগিলাম, তবুতো এখন সুখের আস্বাদন পেলুম না—আর যে কতকাল দুঃখ ভুগিব তাহার স্থির নাই—বোধ হয় এ কষ্টের শেষ নাই ? শেষ নাই কি ? জগৎ পদ্ধতিতে দেখা যায়—সকল বিষয়েরই একটা শেষ আছে—অবস্থান্তর আছে। ঋতু, সময় দিন রাত্রির একটা শেষ আছে—মানব জীবনেরও একটা শেষ আছে। কুসুম ফুটিয়া উঠে আবার শুখাইয়া যায়—নগর অরণ্য, অরণ্য সহর হয়—ধনী দরিদ্র, দরিদ্র ধনী হয়,—বলী দুর্ব্বল, দুর্ব্বল বলী হয়—তাই বলি সকলের একটা পরিণাম আছে—অবস্থান্তর আছে। হ্রাস বৃদ্ধি প্রায় সকলেতেই লক্ষিত হয়—নদীর জলে, সূর্য্যের তেজে, পবনের বেগে হ্রাস বৃদ্ধি আছে—চন্দ্রের, দিনের, রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি আছে—স্নেহ, প্রণয় স্রোতের, সুখে দুঃখের হ্রাস বৃদ্ধি আছে—তাই ভাবি সকলের চিরকাল সমান ভাবে যায় না—সকল রাত্রি জ্যোৎস্নায় অতিবাহিত হয় না। চিরদিন

সমান যায় না এই মহামন্ত্র বলে দর্পির দর্প, ধনীর অহঙ্কার ও তেজীর গর্ব্ব থাকে না—পাপী নির্ভীক হইতে পারে না—এই মহৌষধি বলে দুর্ব্বল বল পায়, পর-পদ দলিত মানব হৃদয় সাহস পায়—বজ্রপাত মাটীর দেহ সহিতে পারে—আমার মতন সন্তাপিনী তাপিনী জীবনভার বহিয়া থাকে. তাই বলি—এই কথাগুলি জীবন সঞ্চারিণী মন্ত্র বিশেষ—কিন্তু অবোধ মন, অপ্রকৃতিস্থ মস্তক, ইহা বুঝিয়াও বোঝে না। জন্মান্ধ, চিররোগী, আজীবন বধির ও খঞ্জ এবং বঙ্গের বালবিধবাকে দেখিয়া—এ পাগল প্রাণ আর ঐ কথা বুঝিতে পারে না—তখনই মনে হয়, সংসারে রোগ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া—প্রবোধ দিবার অনেক কথাও প্রচলিত আছে—তাহার মধ্যে ইহা একটী আশ্বস্ত বাক্য—উৎসাহ দিবার কৌশল, ধৈর্য্য ধারণ করাইয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সোপান মাত্র, আর কিছুই নয়! নয় কেন? আমার পক্ষে এইতো ঠিক—অগ্রে আমি যা ছিলাম—এখন আর আমি তা নাই—অগ্রে যে সব বস্তু সুন্দর বোধ হইত—এখন সে সকল আর মনোহর অনুভূত হয় না। পূর্ব্বে আমার সুন্দর ও সুখী প্রাণে সবই সুন্দর লাগিত—তখন বনদেবী আমার সম্মুখে সর্ব্বদা হাসিতেন—কুসুম কামিনীকূল আমার সঙ্গে খেলা করিতেন

—আমাকে দেখে পক্ষীকুল আনন্দে কোলাহল করিত নভোমণ্ডল সুন্দর সাজে সাজিত—জলে সুখের তরঙ্গ উঠিত—বায়ু গান করিত; লতা পাতা, ফল ফুল, তালে তালে নৃত্য করিত—নিশানাথ শীতল কিরণে স্নিগ্ধ করিতেন কিন্তু হায় হায় সে সব আর আমার নয়নগোচর হয় না—এখন কেবল বনফুল লতাদিকে কাঁদিতে দেখি—পবন দেবের হায় হায় ধ্বনি শুনিয়া থাকি, জলে শোকের উজান বহিয়া থাকে, আকাশ শূন্য স্থান নির্দ্দেশ করে, পক্ষীকুল কলরবে স্থানান্তরে চলিয়া যায়, নিশামণি মলিন মুখে অস্তমিত হন—তাই ভাবি পূর্ব্বে আমি যা ছিলাম—এখন আমি তা নাই।

শীতল প্রাণে সব শীতল বোধ হয়—দগ্ধ প্রাণে শীতল বস্তুর শীতলতা থাকে না। পূর্ব্বে চন্দ্রের কর, নির্ঝরিণীর জল, ফুলের সৌরভ, বায়ুর গৌরব, পাখির কূজন, ভ্রমর গুঞ্জন, সবই শীতল বোধ হইত। এখন সেই চন্দ্রকর প্রাণ দগ্ধকারী হইয়া থাকে—পাখির কুজন, ভ্রমর গুঞ্জন, বায়ুর প্রবাহ, কর্ণে ও দেহে শেলাঘাত করে—তাই জানিতেছি, পূর্ব্বে আমি যা ছিলাম এখন আমি আর তা নাই। সেই জন্যই বুঝি অগ্রে আদরে গৌরবে যে আমাকে সর্ব্বদা স্নেহ সম্ভাষণ করিত—সে এখন ফিরিয়া চাহিতে, একটী কথা কহিতে কষ্ট বোধ করিয়া থাকে—যে আমায় দেখে

পূর্ব্বে আনন্দে ভাসিত, সোহাগে গলিত, অনিমেষ লোচনে দেখিত—দেখিয়া দেখিয়া যাহার তৃপ্তি হইত না—সে এখন আর সাধিয়া দেখা দিলেও দেখে না—তাঁর দেখা শোনা সকল ফুরায়েছে—তাই বুঝিয়াছি "চিরদিন সমান যায় না।" ভাল, চিরদিন সমান না যাইতে পারে কিন্তু উন্নতি না হইয়া অধোগতি হয় কেন?—বয়স যেমন অনুদিন বাড়িয়া থাকে, জ্ঞান বুদ্ধি যেমন বয়সের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়—বিদ্যার যেমন অনুশীলন ও চর্চ্চাতে উন্নতি হইয়া থাকে, যেমন অভ্যাস ও ভোগে আহারের উন্নতি হইয়া থাকে—মমতা ভালবাসা যেমন সহবাসে বাড়িয়া থাকে—স্নেহ যেমন প্রতিপালনের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়—এ অভাগিনীর সুখ তদ্রূপ কেন বৃদ্ধি না হইয়া, দুঃখে পর্য্যবসিত হইল? আমি স্বর্গীয় নক্ষত্র হইয়া কেন ভূপতিত হইলাম—তাঁর প্রেম সিংহাসন—স্বর্গস্থান হইতে কেন চ্যুত হইলাম? যাহার নিকটে থাকিলে সকল জ্বালা নিবারণ হইত—কোন ক্লেশই অনুভব হইত না—যাঁহার অমিয় মুখখানি পানে চাহিলে সকল ভুলিয়া যাইতাম—যাঁহার মিষ্টি কথায় ক্ষুধা নিদ্রা রহিত হইত-সে এখন আর একটীবার দেখা দিতে—মুখের দুইটী কথা কহিতে আর ইচ্ছা করে না। আমার রোদনে সে পাষাণ আর ভেজে না—তবে কাঁদি কেন। এ চাতকিনীর দারুণ

পণ খাইবার নয়—প্রাণের পিপাসায় মরি, তবু মেঘ পানে চা'হিয়া উর্দ্ধ্ব মুখে 'দে ফটিক্ জল' বলিয়া চিৎকার করি—নিবিড় কালমেঘমণ্ডলে আকাশ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিলে, অন্য সকলে সভয়ে নিরাপদ স্থানে যাইবার চেষ্টা করে—আর চাতকিনী নির্ভয়ে অশনিমাঝে ঘুরিয়া, উড়িয়া, 'দে ফটিক্ জল' বলিয়া কাঁদিয়া থাকে তাই কান্না ছাড়িতে পারি না, নচেৎ বৃথা রোদনে ফল কি ?—রোদনে সুখ কি ? রোদনে সুখও আছে, দুঃখও আছে। যে রোদনে মর্ম্মপীড়ার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না—বিষাদের লেশ মাত্র থাকে না—যে রোদন স্নেহ সুখ, আনন্দ, হাঁসির সহিত মিশিয়া যায়—যে রোদন দেখিলে চক্ষে জল, মুখে হাসি, মনে হর্ষ হয় ; সে রোদন এ হতভাগিনীর কপালে ঘটিল না—দুঃখের রোদনই জীবনাবলম্বন হইল—এই দুঃখের জন্য কান্না পায়, তাই কাঁদি—ক্রন্দন-বারিতে হৃদয়-নিহিত প্রস্তর ভাসিয়া উঠে—দুঃখভারের ক্ষণিক লাঘব হয় তাই কাঁদি—কাঁদিয়া জনম যাবে—এই ভাবি আর চক্ষের জল প্রবল বেগে বহিতে থাকে।

চক্ষের জল কি ? কেন পড়ে ? চক্ষের জল অন্তর্গলান জলীয় পদার্থ। হৃদয়ে যখন কোন প্রবৃত্তির বিশেষ উত্তেজনা হয়—তখন যে ভাব হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া ও নয়নকে শিক্ত করিয়া

বহির্গত হয়—তাহাই চক্ষের জল। হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ হইলে—ইহা উছলিয়া চক্ষু দিয়া নির্গত হয়—অন্তরাগ্নির মহাতেজ কমাইবার জন্য—নিদারুণ শোকাবেগ প্রশমিত করিবার জন্য—হৃদয়ের অস্থিরতা ভাসাইবার জন্য—শুষ্ক মরুভূমের প্রাণ বৃক্ষটীকে বাঁচাইবার জন্য পড়িয়া থাকে। চক্ষের জল আছে বলিয়াই দুঃখ শোক সহনীয় হয়—কঠিন কোমল হয়। চক্ষের জল আছে—তাই মানবের অপার আনন্দ—অসীম দুঃখ, অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। ভক্তি প্রেম সিঞ্চিত হৃদয় চক্ষের জল চায়—তাই পড়ে—তা' বলে সকল রকম চক্ষের জল আমি চাই না। বিচ্ছেদান্তে দম্পতির পূর্ণ মিলনে যে আনন্দাশ্রু বহিয়া থাকে, সেই চক্ষের জল আমার প্রার্থনীয়। লম্পট শঠশ্যাম চন্দ্রাবলীর সাধ পুরাইতে, তাঁর কুঞ্জে নিশি যাপন করিলে ; মঞ্জুল বিপিনে শ্যাম সোহাগিনী মানময়ী শ্রীমতীর যে নয়ন জল পড়িয়াছিল—সে জল আর চাই না—তবে সেই ব্রজেশ্বরীর চক্ষের জল নিবারণ করিতে, চতুর কালাচাঁদকে বিদেশিনী সাজিয়া চক্ষের জলে ভৃগুপদ-চিহ্নিত-বক্ষ ভিজাইয়া সেই শক্তিরূপিনী রাধিকার কোকনদ রাঙ্গা পদে, যে দাসখৎ লিখিতে হইয়াছিল—সেই জল আমি দেখিতে চাই। নিদয় অক্রুর যখন ব্রজের জীবন কৃষ্ণধনকে

হরণ করিয়াছিলেন, তমালকে সোণার কনকলতা হইতে বিচ্ছিন্না করিয়াছিলেন, হিরণহার হইতে নীলকান্তমণিকে তুলিয়া লইয়াছিলেন—তখন ব্রজসৌদামিনী রাধে, শ্যাম নবঘন বিহনে যে চক্ষের জলে ভাসিয়াছিলেন,—প্রেমাধার বংশীধারী বিহনে ব্রজ গোপিনীরা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া, যে নয়ান জলে নিয়ত শিক্ত হইতেন—সে চক্ষের জল চাই না—কিন্তু প্রভাসতীর্থে, দ্বারিকানাথ রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের মনোহর নটবর বেশে ছুটিয়া আসিয়া "আমার রাই কোথায়, রাই কই, কোথা রাই" বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন—সেই চক্ষের জল আমি দেখিতে চাই। মহারাজা দুষ্মন্ত পরিত্যক্তা শকুন্তলার অশ্রুধারা আমি চাই না, পূর্ণমিলনে যে উভয়ের চক্ষের জল মিশিয়া পড়িয়াছিল—সেই মিলনাশ্রু আশা করি। অবসাদ লবণ সমুদ্রে অনেক দিন ডুবিয়া আছি—এখন আনন্দ ক্ষীরোদ সাগরে ডুবিতে চাই। সীতাকুণ্ডের উত্তপ্ত বারি চক্ষে আর বহিতে পারি না, তাই শীতল বারি পাইবার জন্য কাঁদিয়া মরিতেছি। যদি ভাগ্যদোষে সেই শীতল জল না পাই—তাহা হইলে আমার বিরহের বারিধারা তাঁর চক্ষে দেখিতে চাই। রামময়জীবিতে জনক নন্দিনীর অগ্নি প্রবেশ কালে—রঘুকুলমণির পদ্মপলাশলোচনে যে প্রস্রবণ বহিয়াছিল—

সেই প্রস্রবণ তাঁর চক্ষে দেখিতে চাই। আদ্যাশক্তি মহাসতী দেহ ত্যাগ করিলে, পাগল সদানন্দের ত্রিলোচনে, যে অবিরল জলধারা বিগলিত হইয়াছিল—ইন্দুমতির বিরহে, অজ রাজার নয়নে যে নির্ঝরিণী বহিয়াছিল—সেই অশ্রু প্রবাহ আজ তাঁর চক্ষে দেখিতে চাই—তা' হলেও দুঃখে সুখ পাই। আমি মরিলে সে যদি চিরদিন রোদন করে—তা' হলে মরণেও মঙ্গল হয়, মরিয়াও সুখ পাই—কিন্তু কাতরা ময়ূরী যাইবে, অব্যবহিত পরেই তিনি সুখের কপোতিনী লইয়া নব-প্রেমোন্মাদে মাতিবেন—উদ্ভ্রান্ত ভাবের অভাব হইবে এটী মরিয়াও সহ্য করিতে পারিব না—তাই মরণে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে জানিনা—বুঝিনা, বলিয়া মরিতে পারিতেছি না।

তবে এখন উপায় কি? পূর্ব্বস্মৃতিকে বিস্মৃতির গর্ভে নিহিত করা—যাহাকে না ভুলিয়া এত যাতনা পাইতেছি, তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া। ভোলামন! তুমি যে আজ কাল সব ভোল—আহার করিতে ভোল, খেলিতে, বেড়াইতে নিদ্রা যাইতে, অন্যমন হইতে, ভোল—হাঁসিতে ভোল।

হাঁসি কি? সকলে হাঁসিতে চায় কেন?

হাঁসি অন্তরের মধুর উচ্ছ্বাস—বসন্তের প্রিয় কুসুম আনন্দের জ্যোতিঃ, সন্তোষের সৌরভ—সুখের পরি-

চায়ক - রমণীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক, প্রণয়ের ফাঁদ—তাই হাঁসিটীকে সকলে ভাল বাসে। এ জগতে সুখের বড়ই অভাব তাই হাঁসিটীকে সকলে ভাল বাসে। হাঁসি না আসিলেও যত্নে তাহাকে আনিয়া মনকে ফিরাইতে চেষ্টা করে—দুঃশ্চিন্তা রাগাদিকে হাঁসির সাহায্যে চাপা দিতে যত্ন করে, মনের কষ্টকে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পায়। লোকে কথায় বলে "যেন হেঁসে খেলে যেতে পারি।"

জগতে সকল বস্তুই প্রায় ভাল মন্দ মিশ্রিত—রোদনে, বিরহে যেমন ভাল মন্দ আছে—হাঁসিতেও তদ্রূপ ভালমন্দ আছে—এজন্য সকল প্রকার হাঁসি ভাল নহে—সকল রকম হাঁসি সকলের প্রিয় নহে—সকলে চায় না। পাগলের অর্থহীন হাঁসি—নির্ব্বোধের অকারণ উচ্চহাঁসি, পরদুঃখে নিষ্ঠুর হিংসুকের হাঁসি—শঠের মন পরীক্ষার হাঁসি, কৌশলীর হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবার হাঁসি,—দুর্ভাগার অনেক দুঃখের হাঁসি, একের বিপদে অন্যের হাঁসি—কেহ ভালবাসে না—কিন্তু বালকের পবিত্র হাঁসি, কুসুমের নির্ম্মল হাঁসি, সুখীর মনখোলা হাঁসি, প্রেমিকের প্রাণভরা হাঁসি,—ধার্ম্মিকের উল্লাস-হাঁসি—সৎকার্য্যের মধুর হাঁসি—দয়ালুর আনন্দের হাঁসি—হাঁসিতে সকলেই লালায়িত হয়, প্রার্থনা করে।

এই হাঁসি, দয়াময় যাহাকে হাঁসিতে দেন-"সেই হাঁসে। আমাকে হাঁসিতে দেন নাই—তাই হাঁসি ভুলিয়াছি।

তাই ঘুরে ফিরে আবার বলি—ভোলামন তুমি কত কি কর, কত কি বল—কত কি ভাব, আবার সব ভুলিয়া যাও। যে ভাবনায় এ অপার ভাবনা, সে ভাবনা কেন ত্যাগ কর না। ভাবনা মনুষ্য ধর্ম্ম—মন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, একটা না একটা ভাবে নিযুক্ত থাকে। কেহ মন সংযত করিয়া ভব-কর্ণধারের অপীব্য রাঙ্গাচরণ হৃদকমলে,—রাখিবার জন্য—বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভাবিতে থাকেন—কেহ চক্ষু মুদিয়া ভূতকার্য্যের ফলাফল ভাবিতে থাকেন—কেহ দেশের হিতসাধন জন্য—লোকের দুঃখ ক্লেশ মোচনের উপায় উদ্ভাবন জন্য ভাবিতে থাকেন—কেহ নিজ উন্নতির জন্য ভাবে—কেহ পরের অনিষ্ট করিবার জন্য ভাবে—কেহ মজিয়া ভাবে কেহ মজাইবার জন্য ভাবে, কেহ হাঁসিতে হাঁসিতে হাসির কথা ভাবে, আর কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখ খেদের কথা ভাবে—তাই কাঁদি আর ভাবি—সুতরাং ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিনা। কাঁদিয়া আর লাভ কি? বনে বৃথা রোদনে ফল কি? পাষাণের নিকট জল ভিক্ষায় স্বার্থ কি? বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে মন বুঝিতে পারে না।

এ জগতে অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যায় না—অথবা বুঝিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে আকর্ষণী শক্তি কেন? চুম্বুক লৌহকে টানে কেন—সকল বীজ রোপণ করিলে সকল সময়ে ফলবান না হয় কেন? মানবের পবিত্রহৃদয়ে পাপ চিন্তা আসে কেন? পুণ্যময়ের সৃষ্ট জগতে পাপ ও দুঃখের এত আধিক্য কেন? ধার্ম্মিকে কষ্ট পায় কেন? মাতার স্নেহের, মাতৃ স্তন-দুগ্ধের অংশ দিতে পারা যায়—কিন্তু পতি প্রেমের অংশীদার হইলে, এত অসহ্য যাতনা—বোধ হয় কেন? সতী পতি না পায় কেন? এ সকল আজ বুঝিতে পারিতেছি না।

আজ এইমাত্র বুঝিতেছি—যেখানে একজনের কষ্ট দেখিলে অন্যের প্রাণে আঘাত লাগে—একজনের বিষণ্ন বদন দেখিলে, অন্যের আনন্দময় হৃদয় নিরানন্দময় হইয়া যায়—একজনের অপমানে অন্যের হৃদয়ে ব্যথা লাগে, একজনের অযত্নে অন্যের চক্ষে জল আইসে, সেইখানেই উভয় মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। এই ভালবাসা হারাইয়া, দুঃখে কাঁদিবার—সুখে আনন্দ করিবার—বিপদে মাথা দিবার—শোকে সান্ত্বনা করিবার—হাঁসিলে হাঁসিবার—ডুবিলে তুলিবার—ভাসিলে ধরিবার, লোক হারাইয়াছি—আর সেই সঙ্গে গৃহে আস্থা, কার্য্যে আসক্তি, বেশভূষায় অনুরাগ,

জীবনে সুখ, দেহ যত্ন সকলই হারাইয়াছি—তাই আজ ছার সংসারে, সতিনী তাপিনী উন্মাদিনী হইয়াছি ও আমার প্রাণের ব্যথার পরিচয় "উন্মাদিনীর প্রলাপ" পদবাচ্য হইয়াছে।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

—:০:—

সাধারণ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "যে দাতা সেই কৃপণ" আর "যে কৃপণ সেই দাতা"। স্থান বা কার্য্য বিশেষে হতে পারে, নহিলে কথা থাকিবে কেন! অকাতরে অনিয়মিত দান করিয়া শেষে কৃপণতার প্রয়োজন হইয়া থাকে—আর কৃপণ বহুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া, ধর্ম্ম ও যশঃ লাভার্থে দাতা হতে পারেন। যে দান করে সে তুলিয়া রাখে, একগুণ দিলে শতগুণ পায়—কেবল তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে সৎকার্য্যের নির্ম্মলানন্দ, দানের সুখ ভোগ করেন। আর যে দান না করিয়া তুলিয়া রাখে—সে পরের জন্য রাখিয়া যায়—কিছু না পাইয়া, পাইবার কোনরূপ আশা না রাখিয়া পরকে দিয়া যায়—তাই লোকে বলে "যে দাতা সেই কৃপণ, যে কৃপণ সেই দাতা"।

দাতা হওয়া ভাল বটে কিন্তু আপনার রেখে—মনু আপনার রাখিয়া দাতা হইতে বলিয়াছেন। জগতের সমস্তই সীমাবিশিষ্ট—এই সীমা উল্লঙ্ঘনই দোষনীয়। এজন্য দানেরও সীমা থাকা উচিত—আয়ব্যয় বুঝিয়া দানের নিয়ম করা প্রয়োজন। পণ্ডিত প্রবর চাণক্য বলিয়াছেন,—"সর্ব্বমত্যন্তম গর্হিতম," তাই বলি বিবে-

চনা করিয়া দানের একটী পরিমাণ করা আবশ্যক; নচেৎ বলিরাজার ন্যায় দাতা হইতে নাই—বীর কর্ণের ন্যায় দাতা হইতে নাই—আমার ন্যায় দাতা হইতে নাই। "আপনার ধন পরকে দিয়া, দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়া'—বলিরাজা দাতা হইয়া পাতালে আবদ্ধ হইলেন— মহারথী কর্ণ নিজ কনক কুণ্ডলী দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়া, অর্জ্জুনের বধ্য হইলেন— আর আমি আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিয়া জন্মদুঃখিনী উন্মাদিনী হইলাম।

"যে দাতা সেই কৃপণ" ইহার নিগূঢ় ভাবার্থ বুঝিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার পূর্ব্বে, যদি কৃপণ হইতে পারিতাম তাহা হইলে আজ স্থান ভ্রষ্ট গ্রহর ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ছুটীতে হইত না—স্রোতের কুটার মতন এদিকে ওদিকে ভাসিতে হইত না—অবোধ প্রাণ আজ সমস্ত খোওয়াইয়া, পাগলের মতন কাঁদিয়া বেড়াইত না।

তবে কৃপণ হই নাই কেন?—কেমন করে হবো—কৃপণতা আমাদের সরলা অবলার জাতীয় জীবনে নাই, কামিনী স্বভাবে নাই। যাহার হৃদয়ে দয়ামায়া আছে —সে কখন কৃপণ হইতে পারে না। দয়াবতী প্রকৃতি দেবী জগতের প্রতি কৃপণা নহেন—আদ্যাশক্তি ভগবতীর দেহখানি মায়ায় গঠিত বলিয়া, লোকে তাঁহাকে

মহামায়া জগত জননী বলিয়া থাকে। লোকে সাধারণতঃ দেখিয়া, শুনিয়া, ভুগিয়া বলে যে 'কু পিতা যদিও হয়, কু-মাতা কখন নয়' মাতা পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ভার বহন করেন। পত্নি-বিয়োগ বিলাপ ক্ষণস্থায়ী হৃদয়ের উদ্বেলতা কিন্তু পতি-বিরহ বিধুরার কাতরোক্তি, হৃদয়কে আলোড়িত, অন্তরকে পেষিত করিয়া নির্গত হয়।

রমণীর হৃদয় কোমল বলিয়াই বুঝি শোকদুঃখাদি তাহাদের প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া থাকে—জগত-পিতা অবলাকুলকে চিরদুঃখিনী করিবার অভিপ্রায়ে কি তাহাদের কোমল-হৃদয়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? কখনই নয়—জগতের প্রাকৃতিক অবস্থা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে—যাহা কোমল ও তরল তাহাই রসাল—সরস বস্তু ভিন্ন জগতের কোন বিশেষ উপকার সংশাধিত হইবার উপায় নাই– কোন সৌন্দর্য্য প্রতিপাদিত হয় না—নীরস হৃদয়ে যত্ন মায়া, স্নেহ দয়া, উষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায় না। নীরস বৃক্ষে ফল পুষ্পের আশা দূরে থাকুক, একটী কিসলয় পর্য্যন্ত নয়নগোচর হয় না।

কোমলেই তরঙ্গের উৎপত্তি; যে হৃদয়ে তরঙ্গ নাই—প্রবাহ নাই, সে হৃদয়ে ভাবোদ্দীপনাও নাই—সে হৃদয় প্রকৃত মনুষ্য হৃদয় নহে সে কখন ভাবুক

হইতে পারে না। যা'র হৃদয়ে ভাব লহরী খেলে না—সে প্রত্যক্ষ জগতের সুখ সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না—সে সজীবে নির্জীব, কোমলে কঠিন। পরের দুঃখে যাহার প্রাণ কাঁদে না, সে কখন পরের হইতে পারে না—যে এ জগতে পরের না হইল তাহার জীবন ধারণই বৃথা। যে হৃদয়ে সীমাবদ্ধ জগতের ভাব ধরে না, সে হৃদয়ে অনন্ত স্বর্গীয় ভাবের স্থান কোথায়? এ জগতের সামান্য প্রেমের যে প্রেমিক না হইল—সে কিরূপে প্রেমময়ের অপার প্রেমের প্রেমিক হইবে; সুতরাং হৃদয়ে ভাবোদ্দীপণতা না থাকিলে, ইহকাল পরোকালের কোন উপায় নাই। কোমল হৃদয় না হইলে ভাবান্দোলন থাকেনা—তাই ভাবি, কোমল হৃদয় বিশ্বপিতার দয়ার একটী নিদর্শন—তাই কোমল হৃদয় সর্ব্বজন প্রশংসিত।

রমণী হৃদয় দয়া মায়ায় গঠিত—এজন্য সকলে কামিনীকুলকে কোমলা বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন; সহজে ভুলিয়া যায় বলিয়া, সরলা অবলা বলিয়া থাকেন; ধৈর্য্য সহ্য আছে বলিয়া গৃহের ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা পরের দুঃখে কাঁদিয়া মরি, পরের জ্বালায় জ্বলিয়া থাকি, পরের কষ্ট ভার বহিয়া থাকি,—পরকে আপনার করিয়া ভাবিতে পারি—লইতে পারি, তাই আমাদের প্রিয়তমা-অর্দ্ধাঙ্গী—জীবনতোষিনী

বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। আমরা তাহাদের জন্য প্রাণ ঢালি, সকল সুখে জলাঞ্জলী দি—রোগে প্রাণ-পণে সেবা করি, মুখে মুখে সকল কার্য্য মনের মতন সমাধা করিয়া থাকি—তাঁহাদের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া থাকি—যা কিছু ভাল সব অগ্রে তাহাদের দিয়া থাকি—তাহাদের জন্য কিছুতেই বিমুখা হই না—তাই আমাদের লক্ষ্মীরূপিনী বলিয়া থাকেন—তাহাদিগকে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, জীবনের অবলম্বন করি—প্রণয় লতিকা হইয়া পাদযুগল ধরিয়া থাকি—এ জীবনে ক্রীতদাসী হইয়া থাকি—তাই সোহাগে "প্রাণেশ্বরী হৃদয় বল্লভা" বলিয়া থাকেন—তাই বলি অবলা কামিনী-কূল কৃপণা হইতে জানে না।

প্রাণ দিয়া মন পাই না—তথাচ প্রাণ ফিরাইতে পারি না—ফিরাইতেও চাই না। এ দেহ সে পদে বিকাইয়া, এ জীবন তাঁহার করে জন্মের মতন সমর্পণ করিয়া—মুখের একটু মিষ্টি পর্য্যন্ত পাই না—তবুও ভালবাসা ফিরাইয়া চাহিতে পারি না—তাই ভাবি "যে দাতা সে কৃপণ' এই কথা খাটে কই? আমরা দাতা, কৃপণ কই? দিয়া লাভ কি?—লভ্য আছে, স্বার্থ আছে, তা নহিলে ঐ কথা হবে কেন?

তাঁহার মধুর কথায় মিষ্টী পাই, তাই নিকটে থাকিয়া কথা সর্ব্বদা শুনিতে চাই। সেই মুখখানি দেখিতে

বড় ভাল লাগে, তাই অনিমেষ লোচনে না-জানি-কি মাখান সেই মুখের পানে চাহিয়া থাকি—তার তৃপ্তিতে তৃপ্তি হই—তার সঙ্গে থাকিয়া স্বর্গসুখ পাই—তাঁর হাঁসিতে হাঁসি পায়—তার বিষণ্ণ বদন দেখিলে কান্না আসে, তাই মন খুলিয়া স্বইচ্ছায় তার সুখ দুঃখের ভাগিনী হই। ভালবাসি বলিয়া অকাতরে সর্ব্বস্ব দান করি—ভালবাসার প্রত্যার্পণের আশায় দাতা হই

তাঁহারা আমাদের চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিতে দেন না; সংসারের কোন ক্লেশকর গুরুতর ভার আমাদের উপর অর্পণ করেন না; আমাদের সন্তুষ্ট রাখিতে যথাসাধ্য অনুক্ষণ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন, আমাদের কষ্ট নিবারণ করিতে, সুখী করিতে, আপনাদের জীবন দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখেন; আমাদের বিপদে প্রাণ দিতে ক্ষণমাত্রেরও জন্য বিমুখ হন না—একগুণ দিয়া শতগুণ পাই, তাই বুঝি "যে দাতা সেই কৃপণ"।

আমরা তাহাদের সংসার জালে জড়াইয়া ফেলি, মস্তকে নানাভার দিয়া থাকি—পুত্র কন্যাদি দিয়া জ্বালা কষ্ট ও ভাবনা বৃদ্ধি করাইয়া থাকি—সঙ্গে থাকিয়া বিপদগ্রস্থ করি—মানীনী হইয়া পায়ে ধরাই, তাই তাহাদের মন যোগাইয়া কার্য্য করি, অসময়ে সেবা করি। স্বভাবতঃ আমরা দুর্ব্বলা—তাহারা দুর্ব্বলের বল, বিপদে ভরসা, অনাথার নাথ, দুঃখে সান্ত্বনা,

লতার আশ্রয় বৃক্ষ—তাই তাহাদের জন্য প্রাণ ঢালি—তাহাদের জন্য কাতরা হই, তাই বলি "যে দাতা সেই কৃপণ"।

আমরা সৌন্দর্য্যের কাঙ্গালিনী—যা কিছু সুন্দর সব আমরা ভালবাসি—তাই সুন্দর গৃহটীকে সুন্দর করিয়া সাজাইতে চাই—সুন্দর উপবনে, সুন্দর সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া—সুন্দরী সাজিয়া সুন্দর রাত্রিতে বেড়াইতে চাই—সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিতে, পরিতে খেলিতে ভালবাসি—কপালটীকে সুন্দর দেখাইবার জন্য সুন্দর করিয়া টিপ্ পরি—পা দুইটীকে সুন্দর করিবার জন্য, ঘষিয়া ঘষিয়া পাত্‌লা করি—যেমন করিয়া চলিলে, পা ফেলিলে, উঠিলে, বসিলে, কথা কহিলে, হাঁসিলে সুন্দর দেখায় তাহা শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে যত্ন করি—কাল চুলে সুন্দর করিয়া খোঁপা বাঁধি—এ প্রবৃত্তি কি আমাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হেতু জন্মিয়া থাকে? বোধ হয় নয়। জগতে সৌন্দর্য্যের অভাব আছে বলিয়া, জগৎবাসি সকলেই সৌন্দর্য্যের অভিলাষী। নির্দ্দোষ ও পূর্ণ সৌন্দর্য্য এ জগতে লক্ষিত হয় না; তাই চিত্রকরের অসাধারণ ক্ষমতার আবশ্যক হয়, কবিদিগকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—এজন্য জগতে যাহা দেখা যায় না, এরূপ চিত্র আঁকিতে হয়—রূপবর্ণনা করিতে

হয়—এই কারণেই চন্দ্রকে কলঙ্ক শূন্য করিতে হয়, মৃণালের কণ্টক খসাইতে হয়, চঞ্চলা চপলাকে স্থির-সৌদামিনী রূপে ভাবিতে হয়, কোকিলের স্বর রমণী সঙ্গীতে মিশাইতে হয়, অর্দ্ধ-নিমজ্জিত কমলকলি যুবতীর রসালবক্ষে রোপণ করিতে হয়—তিল ফুলে নাসিকা, চম্পককলি দ্বারায় অঙ্গুলী ও কুন্দপুষ্প দ্বারায় দন্ত গঠিতে হয়। এই জন্যই "বিধাতা ইহাকে মানসে গঠিয়াছেন" এইরূপ বর্ণনা আছে। কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মিকী পতিবল্লভা সীতাদেবীকে, এই কারণেই মানবী কন্যা না বলিয়া, পৃথিবী-কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবিবর কালিদাস শকুন্তলাকে অপ্সরা গর্ভ-জাতা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অন্যান্য কাব্যে নায়িকাদিগকে শাপভ্রষ্টা স্বর্গীয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, মনুষ্য গর্ভজাতা বলা হয় না। ত্রিজগতে একাধারে নির্দ্দোষ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সৌন্দর্য্য নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যদি তাহা হইত—তা'হলে সমস্ত সুন্দর পদার্থের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমার সৃষ্টির প্রয়োজন হইত না—হর-মনমোহন করিতে স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথকে মোহিনী রূপ ধারণ করিতে হইত না—তাই পড়িয়া শুনিয়া ভাবিয়া বলি, সৌন্দর্য্যের অভাব হেতু, জগতের সকলেই সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল—তাই আমরাও সৌন্দর্য্যের ভিখারিণী—তাই সকলের নিকট

তিল তিল সৌন্দর্য্য ভিক্ষা করিয়া তিলোত্তমা সাজিতে প্রয়াস পাই—স্বর্ণ, রৌপ্য হীরকাদিকে, সাজাইয়া, মানাইয়া, প্রয়োজন মতে গঠিয়া, দেহে ধারণ করিতে ব্যস্ত হই—অলক্তকের নিকট, অধর রাগের নিকট, অঞ্জনের নিকট, বেশ ভূষার নিকট, হাব ভাব—ঠাস্ ঠমকের নিকট সৌন্দর্য্য ভিক্ষা করিয়া থাকি।

যৌবন কাননে রূপের সুন্দর ফুল ফুটাইয়া, নাগর ভ্রমরকে বাঁধিবার জন্য—সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী শক্তি-বলে, নাথকে আবদ্ধ করিবার জন্য অবলা কামিনী-কূল সৌন্দর্য্যের ভিখারিণী—নচেৎ রূপ সৌন্দর্য্যের আবশ্যক কি?

এখানে রূপ কি?—সৌন্দর্য্য কি? এই প্রশ্নটী মনে স্বতঃই উদয় হলো। সৌন্দর্য্য একটী সুখের আধার সন্দেহ নাই। সুন্দর বালকবালিকাকে কে না আদর করে?—সুন্দর পাখীগুলিকে কে না যত্ন করে?—সুন্দর দৃশ্যে কে না বিমুগ্ধ হয়?—সুন্দর পতী বা পত্নী হইবে এটী কে না ইচ্ছা করে?

স্বর্ণ পাত্রের নির্ম্মল বারি, মৃণ্ময় পাত্রের স্বচ্ছ জলাপেক্ষা পানকালে অধিক তৃপ্তিকর না হইলেও—স্বর্ণ পাত্রের জল পানে যে একটী বিশেষ সুখানুভব হয়—অল্প অনুজ্জ্বল ভোজন পাত্রাপেক্ষা, সমুধিক উজ্জ্বল ভোজন পাত্রে, আহারে যে একটী তৃপ্তি অনু-

ভব হয়, তাহার কিয়দংশ সৌন্দর্য্যজনিত বলিতে হয় বটে কিন্তু বুঝিতে গেলে, সৌন্দর্য্যের ধারণা, লোকের সংস্কার ও রুচি অনুসারে নির্দ্ধারিত ও অনুভাবিত হইয়া থাকে মাত্র—নচেৎ রূপ, সৌন্দর্য্য আকাশ-কুসুম, নয়নের মনোনীত, রুচি-প্রবৃত্তি সম্মতঃ, ভাল-বাসার বর্ণাঙ্গিত দ্রব্য মাত্র। সাধারণ কথায় বলে,—

“ভাল দেখ কারে, ভালবাসি যারে
সুন্দর দেখ কারে, ভালবাসি যারে”

তিনি বিড়াল নেত্র পছন্দ করেন, আমি কাল নয়ন পছন্দ করি—তুমি সুবর্ণ-কুন্তলা নারীকে সুন্দরী বল, তিনি গাঢ় কেশজালবিশিষ্টা কামিনীকে সুন্দর বলেন। জ্যোৎস্না বর্ণ কাহার প্রিয়, আর কেহ তাহাতে একটু হরিদ্রাবর্ণ মিশাইয়া, চম্পক বরণ করিয়া দেখিতে চান—আর কেহ কেহ বা দুধে আল্‌তা বর্ণের জন্য লালায়িত। তুমি যাহাকে কাল বলো, তিনি তাহাকে শ্যামাসুন্দরী বলেন। যে চলন তুমি ভাল দেখ—সে চলন তিনি বাঁকা দেখেন—যে স্বর আমার মিষ্টী লাগে, সে স্বর তাঁহার কর্কশ বোধ হয়—তাই বুঝি রূপ মনের প্রবৃত্তি ও রুচির উপর নির্ভর করে—নচেৎ রূপ বিজলীর খেলা, জোয়ারের জল এই আছে এই নাই। রূপের আলোতে সংসার সম্পূর্ণ আলোকিত হয় না বা চিরদিন আলোকিত

থাকে না। সৌন্দর্য্যে হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হয় না—সংসারের সকল সাধ পোরে না—সকল পিপাসা মেটে না। রূপ ধুইয়া খাইবার জিনিষ নহে—খাইলেও ক্ষুধা নিবৃত্তি পায় না, দেহ রক্ষা হয় না।

তবে সে আজ রূপে মজে কেন? সে ফাঁদে পড়ে কেন? সে যুবতীকে প্রেমিকা ভাবিয়া সে প্রেমে উন্মত্ত কেন?

"না হলে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না।
এ রস প্রবীণে বিনে, নবীনে সম্ভবে না" ॥

এই ভাবের ধারণা তাহার মনে না আ'সে কেন? কুটিল কাল যৌবন ভাণ্ডারের বাছা বাছা রত্নগুলি অপহরণ করিয়াছে—নিষ্ঠুর নিদাঘ যৌবন কাননের সমস্ত আকর্ষনীয় দ্রব্য গুলি অপচয় করিয়াছে—কেবল পোড়ার জ্বালানুভব করিবার জন্য, হৃদয়ের ভাব হরণ করে নাই—প্রাণকে হাবুডুবু খাওয়াইবার জন্য, প্রেমরস শোষিত করে নাই। পরিমল থাকিতে থাকিতে কুসুম দেহ ত্যাগ করিলে, আজ ভ্রমর পরিত্যক্তা হইয়া জীবন্মৃতা হইতে হইত না—পত্র নীরস সৌন্দর্য্যহীন হইয়া বৃন্তচ্যুৎ হইয়াছে বলিয়া, আজ সমীরণ তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া পদদলিত করিতেছে।

এই সকল ভাবিয়া ক্ষোভে ও মরমে মরিয়া বলি

—রূপ কি বুঝিলাম না—আমার মতন দুঃখিনী সন্ন্যাসিনীর রূপ সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন কি ? তাহাও ভাবিয়া পাইলাম না। যাহাদের রূপমাধুরী দেখিয়া মন খুলিয়া "আহা মরি" বলিয়া আদর করিবার লোক থাকে—সোহাগে নাচাইবার লোক থাকে ; আর সেই রূপে মাতিয়া, গলিয়া গিয়া, পুনঃ পুনঃ অতৃপ্ত নয়নে দেখিবার—কর্ণে অবিরত সুধা বর্ষণ করিবার লোক থাকে, সেই সৌন্দর্য্য কাঙ্গালিনীদের মনের বাসনা পূর্ণ হয়, সকল যত্ন ও শ্রম সার্থক হয়, ভিক্ষার সকল কষ্ট বিদূরিত হয় মনে সুখ স্রোতের উজান বহে তখন বুঝিতে পারি, "যে দাতা সেই কৃপণ"। আর যখন সে সজল নয়নে কাতর ভাবে এ যৌবন লুঠিতে যাচিঞা করিত—আমার পার্শ্বে বসিয়া কখন-ভুলিবার-নয় এমন কত কি প্রেম ভরা মধুর বাক্যে তুষিতে যত্নবান হইত—নয়নে নয়নে, প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মিশাইয়া আমার প্রেম-ভিখারী হইয়া মন প্রাণ ভিক্ষা করিয়াছিল তখন "যে দাতা সেই কৃপণ" ইহার সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ও হরি ! তিনি কি আমার ভিক্ষুক !!! কিসে ভিক্ষুক ? আমি কিসে ভিখারিণী নই ? যাহার আকাঙ্ক্ষা মেটে না সেই ভিখারী—অভাবই ভিখারীর ধর্ম্ম—তাই দুঃখে ভাবিয়া বলি. তিনি ভিক্ষুক। এ

জগতে ভিক্ষুক কে নয় ? মানবের আশার সীমা নাই, শেষ নাই ; বাসনার পরিতৃপ্তি নাই, পিপাসার নিবৃত্তি নাই—তাই সকলে আশা-বায়ু-তাড়িত হইয়া ঘুরিতেছে বাসনা সাগরে ঝাঁপ দিতেছে, আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে—শেষে আমার মতন নিরাশা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

এজন্য এ জগতে শান্তি নাই, সন্তোষ নাই—সমস্ত জগতের মর্ম্ম দেশে ধিকি ধিকি ভাবে বা প্রবলরূপে অতৃপ্তির অনল জ্বলিতেছে। যে দাতার নিকট ভিখারিণী হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাঁহার নিকট ভিক্ষা পাইয়া এতদিন আনন্দে দিনপাত করিয়াছি—এক্ষণে সে ভিক্ষা না পাইয়া জনম-দুঃখিনী হইয়াছি—তাই ভাবি জগতে ভিক্ষুক কে নয় ? ভিখারিণী কে নয় ! তাই বলি ভিক্ষুক হওয়া মন্দ নয়—কিন্তু ছদ্মবেশী ভিক্ষুক ভাল নয়—তাই যখন ভাবিয়া দেখি যে, তিনি ভিক্ষুক বেশে, ঘর অনুসন্ধান করিয়া অবলার প্রাণ অপহরণ করিয়াছেন. কিছু না দিয়া, কপটতার আশ্রয়ে সরলার মন চুরি করিয়াছেন, তখন ভাবিলাম, সে সমর দক্ষ কৌশলময় কুটিল রাজা। এ জনমে উভয়ে উভয়ের থাকিব—পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিব, এই নিয়মে মিলন করিয়া—সন্ধি স্থাপনা করিয়া, ছলে বলে কৌশলে আমার সর্ব্বস্ব করতলস্থ করিয়া, স্বকার্য্য

সাধনে নিযুক্ত হইলেন তখন ঠকিয়া—দিন হারাইয়া বুঝিলাম—স্বার্থপর কপটের নিকট দাতা হইয়া শেষে পরিতাপ মাত্র সার হইল। সে ভিক্ষুকের আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া দানগ্রহণ করিল না—মায়ার ভাণ করিয়া ঠকাইয়া গেল—বামন দেবের ন্যায় ক্ষুদ্র রাঙ্গা পাদপদ্ম দেখাইয়া, তাহার ত্রিপদে বলী রাজার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল—এখন কথার অপরার্দ্ধ "যে কৃপণ সে দাতা" ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম।

তাই এখন অনুতাপ হয় যে, পূর্ব্বে যদি আপনার হিতাহিত বুঝিয়া, তাহার মনপ্রাণ অগ্রে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া শেষে সর্ব্বস্ব তা'র হাতে দিতাম—অগ্রে রীতিমতন পাকা জামিন লইয়া, পরে প্রাণ ঢালিয়া বিশ্বাস করিতাম—তাহা হইলে সর্ব্বস্ব হারাইয়া আজ এত হায় হায় করিতে হইত না—পোড়া নয়ন মণি হারাইয়া, চারিদিক শূন্য দেখিয়া আজ অনবরত জলধারা বহন করিত না—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইত না।

যেখানে বজ্রপাতের পূর্ব্বে, প্রিয়দর্শন ছায়াময়ী মেঘরাশি আসেন, তাহার উপর সৌদামিনী মনমু করিয়া খেলিতে থাকে, তাহার পর স্বচ্ছ শীতল জলধারা পতিত হয়, শেষে অশনি পাত হয়, সেখানেও কতক সময়ের জন্য দর্শকের নয়ন প্রাণ শীতল, চাতকের তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে—আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল

না, দর্শনাশা কিছুই সফল হইল না, প্রাণ শীতল হইল না—চাতকিনীর তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—তাই বলি আমার ভাগ্যে আজ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল।

হায় হায়! এই প্রেমোন্মাদিনীর আশা পিপাসা নিবারণ হইবার নয়—যত দেখ, যুগ যুগান্তর ধরিয়া দেখ, তবু শীতলতা ও তৃপ্তি লাভ হইবেনা—ইহার তৃপ্তি সাধন নাই.ইহাতে সময়ের ধারণা হয় না—সুখের নিশা কখন আসিল, কখন যাইল কিছুই মনে হয় না—তাই ভাবি আমার আজ "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল"।

সুখের সময় শীঘ্র যায়, দুঃখের সময় যাইতে চাহে না। বিরহ-বিধুরা নায়িকা নায়কের সুখ সম্মিলনের নিশি নিমেষ মধ্যে ফুরাইয়া যায়—অভাগার দুঃখের যামিনী শীঘ্র যাইতে চায় না। সুখের দিন, চঞ্চল নলিনী-দলগত জলবিন্দুবৎ দেখিতে দেখিতে ঢলিয়া পড়ে—দুঃখের দিন, দুর্ভাগা সংসারীর বক্ষে পাষাণ-ভারে চাপিয়া বসিয়া নিপীড়িত করে—তাই বুঝি সুসময় থাকিতে যে পালাইতে পারে সেই ভাগ্যধরী। সেই সুখের সময় যাইতে পারিলাম না বলিয়া "আজ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত" হইল।

যে মৃত্তিকা হইতে কোমল পুষ্পের উদ্ভব হইয়া থাকে—নিজ ভাগ্য দোষেই সেই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তর ও অঙ্গার রাশি উত্থিত হইল—তাই আজ কোমল

হৃদয় দুঃখের আধার ও কারণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

কোমল বস্তু দ্বারায় কোন স্থান দৃঢ়াঙ্গিত হয় না, ইহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, সামান্য আঘাতে বিকৃত ভাব ধারণ করে, কোন ভার বহনে সক্ষম হয় না ও অল্প অযত্নে নষ্ট হইয়া যায়। তরল হৃদয় অল্প ধাক্কায় উছলিয়া পড়ে, মন্দ বায়ুতে তরঙ্গাকুলিতে হয়, সর্ব্বদা ঢল ঢল করিয়া অস্থির হয়—সেই ভাবিয়াই বলি কোমল-তরল হৃদয় প্রায়ই দুঃখের মূল হইয়া থাকে।

কেবল তরলতা ও কোমলতা লইয়া জগৎ সংসার রক্ষা হয় না—কোমলে কঠিন না মিশিলে সংসার চলিত না—ভক্তির সহিত ভয়ের, দয়ার সহিত বিচারের, দুঃখের সহিত সহিষ্ণুতার, স্ত্রীর সহিত পুরুষের মিশ্রণ না হইলে চলে না—কেবল চাঁদের শীতল কিরণে জীবকূলের জীবন রক্ষা পায় না—প্রখর রবির করণই প্রধান জীবন রক্ষক হইয়া থাকে—শীতলতা পেক্ষায় উত্তাপ কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অধিক উপযোগী -বলের সহিত সৌন্দর্য্য অধিক সুখপ্রদ—বীর হৃদয়ে ামল রমণী প্রকৃতই মনোহর।

কচিপাতা, সরস বৃক্ষ, রসাল পুষ্প যেরূপ প্রয়ো-ীয়—শুষ্ক পাতা, নীরস কষ্ট, রসহীন পুষ্পও তদ্রূপ ান অংশে অপ্রয়োজনীয় নহে। মানব দেহ, রস

রক্ত মাংস ও কঠিন অস্থি দ্বারায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে —কোমল দেহে, কঠিন পদার্থের অলঙ্কারই শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে—কোমল অধর পল্লব মধ্যে কঠিন দন্তগুলি না থাকিলে ভাল দেখায় না—তাই বলি, কোমলের সহিত কঠিন না মিশাইলে, সুখ লাভ হয় না।

সে নির্দ্দয় কঠিন আমার সহিত মিশিল না—তাই এ হৃদয়ের বেগ, মহাসমুদ্রের অপ্রশমিত উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় হইয়া ছুটীতেছে—সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বইচ্ছাই ছুটীতেছে—প্রবল ঝটিকার ন্যায় দিক্‌বিদিক্ নির্ণয় না করিয়া ছুটীতেছে—কুলের কুলকামিনীকে লজ্জাহীনা করিয়া ছুটিতেছে—অসহয়া অবলার হৃদয় ও মস্তক বিঘুর্ণিত করিয়া এক মহা অন্ধকারে ফেলিয়া ছুটিতেছে।

আমার এ অন্ধকারে, তারকা হাঁসে না—মেঘের সঙ্গে চপলা খেলে না—খদ্যোত পর্য্যন্ত জ্বলে না—এ অন্ধকারে কেহ আসিতে পারে না, থাকিতে চায় না—এ অন্ধকারে আমাকে কেহ দেখিতে পায় না, তাই আজ অন্ধকারেকে ভালবাসিতে পারিয়াছি—ইনিই আমার অসময়ের সখা; যে জ্বালা কিছুতেই জুড়ায় না—মহান্ধকারের কোলে শুইলেই, সেই জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে—হিংসা, ঘৃণা, উপহাসাদি আর ছুঁইতে

পারিবে না—আলোকে প্রায় সকল বস্তু দেখা যায়, নয়ন মন নানাদিকে আকৃষ্ট হয়, আলোক শোভাবৃদ্ধিকর ও চঞ্চল—অন্ধকার চঞ্চল নহে, ইহার নিকট সুন্দর কাল, ভাল মন্দ, কোন ভেদাভেদ নাই; ইহার আশ্রয়ে, বাহ্যিক কিছুই দেখা যায় না—অলক্ষ্যে কাঁদিতে পারি—আমার রোদন দেখিয়া কাহার ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পায় না, মনে মনে হাঁসিবে এ আতঙ্গ থাকে না--তাই অন্ধকারকে ভালবাসি। এ জগতের সবই অন্ধকার পূর্ব্বের ও পরের সবই অন্ধকারময়—জগতের শেষই অন্ধকার, তাই অন্ধকারকে ভালবাসি।

হায়! হায়! আমার এমন অদৃষ্টের জোর যে, যে ডালে ভর করি তাহাই ভাঙ্গিয়া যায়। আজ অন্ধকারের আশ্রয় লইলাম, তাই অন্ধকারে দুরাশার আলো জ্বলিয়া উঠিল—দুঃখ ক্ষোভের ঘর্ষণে আলো জ্বলিয়া উঠিল—মৃত্যুর পূর্ব্বে চৈতন্য হইল—তাই কাঁদিয়া জানিতে ইচ্ছা হয়—একজনের সর্ব্বস্ব আর একজন পায় কেন? পূর্ব্বস্বত্ব লোপ হয় কেন? ধর্ম্মপত্নীর বিনাদোষে এত দুর্দ্দশা ও শাস্তি কেন? তাই মরমে মরিয়া জিজ্ঞাসা করি, দেশে কি লোক নাই, আইন নাই, বিচার নাই—তা থাকিলে এ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন? একজনকে মাথায় করিয়া অন্যকে পদে দলিত

করা হয় কেন? সরলা হরিণীকে বধ করিতে কোন বাধা বিঘ্ন থাকে না কেন? স্বামী বিহনে যখন স্ত্রীর সকল সুখে জলাঞ্জলী হয়, পতির জন্য পত্নী সকল দুঃখ ক্লেশ আনন্দে সহ্য করিয়া থাকেন, পতিকে দেবতা ভাবিয়া থাকেন—তখন সেই পতি নবফুলের নূতন মধুপানের সুখ ভোগে কি সে অধিকারী হইতে পারেন? তাই বলি দেশে নিয়ম নাই, সদসৎ বিবেচনা নাই, ব্যথার-ব্যথী নাই, সমস্ত মনের কথা ফুটিয়া বলিবার উপায় নাই—তা'হলেই উপহাস্যাস্পদ হইতে হইবে। কি অবিচার! যার জ্বালা সেই জানে, যে ভোগে সেই বোঝে—যে প্রেমাধীনা পতিপ্রাণা সেই বুঝিবে—এই দুঃখ কষ্টের পাত্রী "উন্মাদিনী" হওয়া ও তাহার মনের কথাগুলি "প্রলাপ" হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নহে।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

—:০:—

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—কীর্ত্তি দেবী এত ভক্ত-বৎসলা যে, যে তাঁহার দাস হইতে পারে, সে এ জগতে অক্ষয় নাম রাখিয়া যায়—সে নাম যুগ যুগান্তরেও অনুজ্জ্বল হয় না। এমন কি কীর্ত্তিধরের কীর্ত্তি কীর্ত্তণ করিয়া, লোকে অবিনাশী নাম পাইয়া থাকে। ব্যাস-দেব পঞ্চ পাণ্ডবের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন—মহর্ষি বাল্মিকী শ্রীরামলীলা বর্ণনা করিয়া অবিনশ্বর হইয়া আছেন।

মৃত্যু কীর্ত্তিধর পুরুষের দেহ নষ্ট করিতে পারে—দেবীর প্রসাদ নাম ও কীর্ত্তির উপর হস্তক্ষেপন করিতে পারে না। এক জাতি যায়, অন্য জাতি আসে—এক বংশ লোপ পায়, নূতন বংশের উদ্ভব হয়—পূর্ব্ব বংশের ও জাতির কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান্ থাকে।

নিয়তির কালস্রোতে—কোন দেশ ডোবে, কোন দেশ ভাসিয়া উঠে—স্বাধীন পরাধীন ও পরাধীন স্বাধীন হয়। গ্রীস্, কার্থেজ, ভারত একদিন স্বাধীন ছিল—স্বাধীনতার জন্য একদিন আর্য্যবংশের প্রিয় সন্তানদের অসংখ্য জীবন উৎসর্গিত হইয়াছিল। মহা-বীর সিপিয়ো, কার্থেজ অবরোধ করিলে, কার্থেজ বীর

রমণীগণ আপনাদের কেশপাশ ছেদনপূর্ব্বক রজ্জু প্রস্তুত করিয়া. যেরূপ স্থায়ী ঘোষণা রাখিয়া গিয়াছেন —তদ্রূপ মামুদের ভারত আক্রমণ কালে হিন্দুবীর সীমন্তিনীগণ যুদ্ধ ব্যয়ের জন্য, নিজের অলঙ্কার স্বইচ্ছায় উন্মোচন করিয়া দিয়া—পতিপুত্রকে সহাস্য বদনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিদায় দিয়া—স্বদেশানুরাগকে পতি পুত্রের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর করিয়া অদ্যাপি প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। আর্য্যজাতির অস্তিত্ব প্রায় লোপ হইয়াছে, তবু এখনও আর্য্যজাতির নাম ও সম্ভ্রম আছে। পৃথ্বিরাজ গিয়াছেন, আর্য্যক্ষমতার নিদর্শন আছে—অনঙ্গপাল গিয়াছেন, আর্য্যজাতির সাহসের পরিচয় আছে—আর্য্যজাতির ধ্বংশাবশেষ নামের গৌরব এখনও আছে—আর্য্যজাতির বিজ্ঞানাদি এখনও মহাসভ্য বিজ্ঞানবিৎ জাতির মধ্যে আদরে সমালোচিত হইতেছে। সাধু তুলসীদাস গিয়াছেন, তাঁহার দোঁহাবলী জ্বলিতেছে—কবি কালিদাস গিয়াছেন, তাঁহার প্রসূত অমূল্য-রত্নগুলি দীপ্তি পাইতেছে। তাই বলি, কীর্ত্তিধর পুরুষের নাম যুগ যুগান্তরেও হীনপ্রভা হয় না।

মুসলমানের রাজত্ব গিয়াছে—মহারাষ্ট্রীয় তেজ নির্ব্বাপিত হইয়াছে—রাজপুতনার সৌভাগ্য-রবি চিরান্ধকারে লীন হইয়াছে—তবু আকবর, শিবজী, সমর সিংহের নাম আছে—তাই বুঝি অনন্ত কালস্রোতে নাম

ও কীর্ত্তি স্থানচ্যুত হয় না। পৃথিবীর লীলা সাঙ্গ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন—বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার কীর্ত্তি আছে—তাই ভাবি যত দিন জগৎ, ততদিন কীর্ত্তি। অনুদিন শত শত প্রাণী ইহ সংসার ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের নাম কত লোকে কত দিন ধরিয়া করিয়া থাকে? কত লোকে তাহাদের গুণ স্মরণে কাতর হয়? কিন্তু কীর্ত্তিধর পুরুষের গুণ কীর্ত্তণ করিতে করিতে অশ্রুপাত হয় কেন? তাহাদের স্মৃতি কালের বিস্মৃতিগর্ভে নিমগ্ন না হয় কেন? তাই বলি "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

এ জগতে সকল বস্তুতেই ভাল মন্দ মিশ্রিত আছে—সকলেই সু, কু, বিদ্যমান আছে। তাই কেহ স্বাধীনতারত্নের পুনরুদ্ধার করিয়া কীর্ত্তিলাভ করে—আর কেহ সেই রত্ন ফেলিয়া, মাটীর দেহ লইয়া পলায়ন করিয়া কীর্ত্তি স্থাপনা করে—কেহ আত্মপ্রাণ পরোপকারে সমর্পণ করিয়া নাম কিনিয়া থাকেন, আর কেহ আজীবন পরের অনিষ্ঠাচরণ ব্রতে ব্রতী হইয়া নাম রাখিয়া যায়—এই জন্যই শকুনী, কালনেমী ও ভীরু লক্ষ্মণ সেনেরও নাম আছে। মহারাজ বল্লাল সেনের নামের সহিত তাঁহার কীর্ত্তির বিষময় বৃক্ষ অদ্যাপি ফলবান্ রহিয়াছে। হৃদয়ে নূতন দুঃখের অবতারণা করিয়া যশ গৌরব সহ এই কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে—এই

কীর্ত্তিতেই অশ্রু নির্গত হইবার নূতন পথ খোদিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তির তেজে অনেক কুলকামিনী ঝল্‌সিয়া যাইতেছে—অনেক কুলবালা উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছে—এই কীর্ত্তির সৌরভে অনেক রমণীর মস্তক বিঘুর্ণিত হইয়াছে, তাই মনে মনে আন্দোলন করি কীর্ত্তি কি? তাই বুঝিতে চাই কীর্ত্তি কি?

যে কার্য্যের দাগ, ছায়া, ক্রিয়াফল, গঠনাদি পড়িয়া থাকে—সকলে দেখিতে পায়, জানিতে পারে, ভোগ করে—যাহা সঙ্গে যায় না—সেই কীর্ত্তি—তাই বলি ধর্ম্মের কাছে কীর্ত্তি কি! অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ইহার কাছে কীর্ত্তি কি? যে ধর্ম্ম ইহকালের বল, পরোকালের সর্ব্বস্ব—যে ধর্ম্মাশ্রয়ে পবিত্র আনন্দ, নির্ম্মল সুখ পাওয়া যায়। যে ধর্ম্মের জন্য, মহাজন জগৎ সংসারের সমস্ত আশা প্রলোভন, ভোগ সুখ, মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে স্বর্গীয় বিমল সুখ-সন্তোষ লাভার্থে—প্রাণপণে তপস্যাচরণে নিমগ্ন হইতেছেন—যে ধর্ম্ম কেবল সঙ্গে যায়, আর সব পড়িয়া থাকে, সেই ধর্ম্মের কাছে কীর্ত্তি কি?

কীর্ত্তি যশের ন্যায় কতক পরিমাণে অপর সাধারণের রসনায় পরিচালিত—লোক সমাজের সংস্কার ও .েচিদ্বারায় গঠিত এবং জনসাধারণের ভাবস্রোতের হিল্লোল মাত্র।

আজ বীরপুরুষদের যে নরহত্যা সমর কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে—মানবের হৃদয় প্রবণতা অন্য পথাবলম্বী হইলে, কল্য তাহা পৈশাচিক কার্য্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে পারে; আজ আমরা যাহাকে রাজধর্ম্ম বলি, কল্য অন্য কেহ তাহাকে সামাজিক অধর্ম্ম বলিবে—দেশ জয়, দেশ লুণ্ঠন আজ রাজধর্ম্ম, কালে সে অত্যাচার বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে—রণকৌশলকে ছলনা চাতুরী, সেনাবলকে দস্যুর বল বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। রণস্থলে ব্যবহৃত নানাপ্রকার বন্দুক কামানাদি—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলিয়া সুখ্যাতির সামগ্রী না হইয়া, মানবজীবনরাশি ক্ষণমাত্র নষ্ট করিবার বহুবিধ উপায় উদ্ভাবনা জন্য ঘৃণার বস্তু বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে—আজ যাহা গুণ, কাল তাহা দোষে পরিণত হইতে পারে—তাই ভাবি কীর্ত্তি কি ?

বৃক্ষ মরিলে যে নীরস গুঁড়ীকাষ্ঠ পড়িয়া থাকে,—জলপ্লাবনের পর যে জলের দাগ থাকে—অগ্নিদাহর পর যে ছাই ভস্ম দেখিতে পাওয়া যায়—আর আর প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ বায়ু হরণ করিলে, যে শুষ্ক পাপড়ী পড়িয়া থাকে তাহাই কীর্ত্তি—দাহন করাই অগ্নিদেবের কীর্ত্তি—জলনিমগ্ন করাই বরুণদেবের কীর্ত্তি,—নীরস পাতা পরিত্যাগ করাই তরুরাজের

কীর্ত্তি —বিষ দংশনই ফণীর কীর্ত্তি—আর, আর সতিনী রূপিনী পত্নীই পতির কীর্ত্তি—তাই বুঝি তিনি কীর্ত্তি-ধর—তাই বলি "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। তিনি বাঁচিয়া থাকুন, তাহার মঙ্গল হউক—আমি মরি ক্ষতি নাই—তিনি আমার সুখে থাকুন, এ প্রাণে সকলি সবে—হা ভগবান্!—বারে বারে, ঘুরে ফিরে এখনও আবার কেন বলি "সে আমার।"

আমার মনবেগ ফিরিল না—উর্দ্ধগত ধূম নিবারিত হইল না—এ রসনা "সে আমার" ভিন্ন আর কিছুই উচ্চারণ করিতে পারিবে না—এ দেহ থাকিতে সে আশা ত্যাগ হইবে না—দেহ গেলেও বোধ হয় আসক্তি যাইবে না—নয়ন উৎপাটিত করিয়া দিলেও, হৃদয়ের নেত্র ফুটাইয়া দেখিতে ছাড়িব না—রসনা কর্ত্তন কর, মনে মনে সে নামোচ্চারণে বিরত হইব না—তাই বলি "সে আমার।"

তাঁহার অদর্শনে, এ হৃদয় হায় হায় করে, মন ছট-ফট করে, নয়ন হইতে অবিরল জলধারা বর্ষণ হয়—তাঁ'কে দেখিবামাত্র হৃদয় "হো হো" করিয়া হাঁসিয়া থাকে, মন সুস্থির হয়, নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হয়, বাহিরে ভিতরে সুশীতল ছায়া পড়ে—তাই মনের সহিত গঠিত "সে আমার" এই ধারণাটী ত্যাগ করিতে পারিতেছি না—যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, পদ্মিনীর ভ্রমর

কণ্টকময়ী কেতকী ছাড়িয়া আবার কমলিনীর হইবেন, হৃদয়ের চাঁদ আবার হৃদয়ে উঠিয়া, অমৃত-কিরণে হৃদয়কে শীতল করিবেন, দুঃখের নিশাবশানে চক্রবাক আবার চক্রবাকীর হইবেন—এ হতভাগিনী এ আশা ছাড়িতে পারিবে না ; তাই আশার দাসী হইয়া ভাবি "সে আমার।"

মানবদেহ ধারণে কেহ আশা ত্যাগ করিতে পারে না। আশা বিশ্বব্যাপিনী, নৈরাশ্যময় সংসারের উজ্জ্বল মণি, দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সাহস যত্ন ও চেষ্টার নায়ক এবং সংসার জটিল তীর্থের সুদক্ষ পাণ্ডা।

এ মাটীর জগতে সকলই মৃণ্ময় ও পঙ্কিলময়—সকল বস্তুই ভাল মন্দ মিশ্রিত—প্রণয়ে মিলন আছে, বিচ্ছেদও আছে—বায়ুতে দেহ রক্ষার পদার্থ আছে, দেহ নাশেরও পদার্থ থাকে—জলে পরিপাক শক্তি আছে, অজীর্ণতাও আছে—পুরুষ-হৃদয়ে অমৃত আছে, গরলও আছে—সেইরূপ আশাতে মোহিনী-শক্তি আছে, ছলনাও আছে। এ বিশ্ব-সংসারে দুর্ব্বলকে প্রপীড়িত করাই ক্ষমতার পরিচয়—বিপন্নকে বিপদগ্রস্থ করাই সুদক্ষতার কার্য্য—আশ্রিতের প্রতি অত্যাচারই প্রভুত্ব—পত্নীর প্রতি পতির নির্দ্দয় ব্যবহারই কর্ত্তব্যপালন—কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেওয়াই মহত্ব—সংসারে একটী সাধারণ কথা প্রচলন আছে "ধনীর মাথায় ধর

ছাতি, নির্ধনীর মাথায় মার লাথি।" জগতের নিয়মে আশা-চালিত—তাই আজ আশা অসহায়া দুঃখিনীকে ছলনা করিতেছে। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"—এ জগতে আশার আশা পূর্ণ হয় না বলিয়া, আশা মানব-জাতিকে ছলনা করে। সেই আশার প্রলোভনে পড়িয়া বলি "সে আমার।"

নচেৎ ঐ কথায় আর ফল নাই—কথায় কিছুই নাই—যদি কথায় কিছু থাকিত, তাহা হইলে কি না হতো?—কথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইত, বিষের জ্বালা নিবারিত হইত, কথার কথায় প্রাণ আশ্বস্থ হইত, লোকে কথার কথায় ভালবাসিত—তাই বলি কেবল কথাতে কিছুই হয় না—আবার ভাবি না হয় কিসে? কথাতেই লোক ভুলিয়া থাকে, কথাই প্রাণকে শীতল করে, কথার গুণেই লোক বাধ্য হয়—কথাতেই আশা জন্মে, তৃপ্তিলাভ হয়, শ্রান্তি বিদূরিত হয়, দেহে বলাধান হইয়া থাকে ও দুঃখভার লাঘব হয়।

নীরদ বারিদান না করিয়াও যেমন জগতকে সু-শীতল করিতে পারে, তদ্রূপ কথা কার্য্যে পরিণত না হইলেও, সেই সময়ের জন্য দগ্ধ-প্রাণের জ্বালাকে উপশমিত করিয়া থাকে—কথাই চিরদিন থাকিয়া যায়, তাই কপালে করাঘাত করিয়া ভাবি আজ সেই কথার পাত্রীও হইলাম না। সে মুখের কথাতেও আর বলিল

না যে "আমি তোমারই"—তাই প্রমত্তা হইয়া বলি কেবল কথাতে কিছুই নাই, কিছুই হয় না, সর্ব্ব সময়ে সুখ পাওয়া যায় না।

তাই ভাবি—এই কথাই আবার কর্ণে শেলাঘাত করে, মর্ম্মকে ভেদ করে, প্রাণে আঘাত দেয়—কথার দুঃখ কথায় যায়, মনের দুঃখ কথায় যায় না—তাই ছলনা, চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকা, কপটতা এত ক্ষোভিত করিয়া থাকে। যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, তাহা কথাতে হয় না বলিয়া আমার হৃদয় আজ মরুভূম হইল, হৃদয়ের প্রেম-বারি নিদাঘ-তাপে শুখাইয়া গেল, আশা পাদপে ফল পূর্ণকায় প্রাপ্ত না হইতে হইতে প্রবল বায়ু তাড়নায় সব খসিয়া পড়িল—প্রাণের জ্বালায় লজ্জা সরমাদি কিছুই আর রক্ষা করিতে পারিলাম না।

লজ্জাই অবলাকুলের প্রধান ভূষণ, ইহার ন্যায় সুন্দর অলঙ্কার স্ত্রী-জাতির আর নাই। ইহার সাহায্যে অনেক নীচ প্রবৃত্তি দমন হইয়া থাকে বলিয়া, ইহা একটী সদ্‌গুণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। লজ্জার প্রভাবেই স্বভাবের দোষ প্রশমিত থাকে বা সংশোধিত হয়। এই জন্যই মুখরা ধীরা, চঞ্চলা স্থিরা, কটু-ভাষিণী, প্রিয়ংবদা হইয়া থাকেন। লজ্জাবতী লতাদের হৃদয়, ভীরুতা ও কোমলতার আধার হইয়া থাকে। লজ্জাই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাই

মুখাবরণে মুখখানি আর অধিক সুন্দর দেখায়—ব্রীড়াশিক্ত নয়ন দুইটি এত মধুরতম বলিয়া বোধ হয়—লজ্জাত্রস্তা কামিনীর সর্প-গমন দেখিতে অধিক মনোহর হইয়া থাকে—নবীন অধর পল্লবের ব্রীড়াঙ্গিত হাঁসিটুকু এত ভাল লাগে—তাই পাতা ঢাকা ফুলের মাধুরীমা এত অধিক প্রকাশ পায়—লজ্জায় ঈষৎ খোলা খোলা কমলিনীর বদনখানি এত অধিক কমনীয় অনুমিত হয়—তাই লজ্জা রক্ষা হইস না বলিয়া অনুতাপিত হই।

কিন্তু পরক্ষণেই প্রেমোন্মত্তার ভাবে ভাবিয়া দেখি যে লজ্জাই রমণী জাতিকে অবরোধিনী করিয়া রাখিয়াছে, লজ্জাই তো কাল, লজ্জাই তো কামিনীর সর্প ভূষণ, লজ্জাই সাধের কণ্টক। এই লজ্জাবশেই, মনের কথা বলি বলি করিয়া সকল বলা হয় না—হৃদয় ভোরে অনিমেষে দেখিতে পারা যায় না—মনের সাধ ও প্রাণের পিপাসা, সব মেটে না—তাই ভাবি লজ্জাই সুখবেগের প্রবল বাঁধ। লজ্জা না থাকিলে রাজা দুষ্মন্তকে হৃদয়ের ভাব জানাইতে শকুন্তলা এত বিলম্ব করিতেন না—কাদম্বরীকে চন্দ্রাপীড়ের বিরহে এত কাতরা হইতে হইত না—ব্রজেশ্বরী রাধিকাকে নীরবে তিরস্কার সহ্য করিয়া অন্তরাগ্নিতে এত দগ্ধ হইতে হইত না।

দেবী সুভদ্রা লজ্জার আবরণ খুলিয়াছিলেন, মনের

দুঃখে অনুতাপিতা হন নাই—দেবী রুক্মিণী লজ্জাকে জলাঞ্জলী দিয়া বিনা ক্লেশে মথুরানাথকে পাইয়াছিলেন—তাই বলি লজ্জাই আমার কাল—আর কেন আমি সে কালকে ভয় করি ? সে কাল আমার কি করিবে ? কি আশায় আর তার মুখপানে চাহিয়া থাকি ? আর কেন লজ্জার অনুরোধ রাখি ? চাতকিনী উচ্চৈঃস্বরে নবজলধরকে ডাকিতে লজ্জা করে না—নবীন নীরদকে দেখিয়া মত্ত শিখিনী পাখা তুলিয়া নাচিতে লজ্জাকে মানে না—কপোতিনী কপোতের মুখচুম্বন করিয়া, নীরবে ঘুরিতে সঙ্কুচিত হয় না—যামিনী স্বীয় নাথকে বক্ষে ধারণ করিয়া হাঁসিয়া ঢলিয়া পড়িতে, লজ্জা ভয় রাখে না—সন্ধ্যা সমীরণ সমাগমে ফুলকুল সুষমাযুক্ত মুখখানি খুলিতে লজ্জাবোধ করে না—সৌদামিনী জগতকে মাতাইয়া মেঘের হৃদয়োপরি খেলিতে লজ্জিতা হয় না—নদীকূল উথলিয়া ছুটিয়া সাগরসঙ্গম লাভে লজ্জার বাধা দেখে না—তবে তাঁহারে প্রেম জানাতে পাগল হৃদয়ের সকল কথা বলিতে কেন লজ্জা করি ? কেন বিলম্ব করি ? মনে কেন আতঙ্কের উদয় হয় ?

অবহেলার পাত্রী হইয়াছি, পাছে ঘৃণার পাত্রী হইয়া উঠি, এই মনে আতঙ্ক হয়—শত বিষের বাতি জ্বলিতোছ, পাছে সহস্র বিষের বাতি জ্বলিয়া উঠে, তাই

ভয় হয়—কপাল ভাঙ্গিয়াছে, পাছে হিতে অহিত হয়, ভাল করিতে গিয়া মন্দ হয় ; তাই ভয় হয়।

সময় মন্দ হইলে, অমৃতে গরল উঠিয়া থাকে—সুকার্য্য কুকার্য্যে পরিণত হয়। দুঃসময়ে মহৎ ক্ষুদ্রের ন্যায়—সাধু অসাধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। মহৎ আশ্রিত শত্রুকে নষ্ট করেন না—অন্ধকারনাশী দীপ, অধঃগত তিমিরকে ধ্বংস করেন না, মহৎ ব্যক্তি অপকারীর উপকারে ক্ষান্ত থাকেন না—তরুরাজ ছেদনকারীকে ছায়া দান করিয়া থাকেন. মহৎ নিজ বিপদে পড়িয়াও পরের উপকার করেন—চন্দন ও কর্পূর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও সুগন্ধি বিস্তার করিয়া থাকেন। সাধু, বালকের ন্যায় শোণিতত্যাগে দুগ্ধ পান—হংসের ন্যায় জল ফেলিয়া দুগ্ধ গ্রহণ—কুলার ন্যায় মন্দ ছাড়িয়া, ভাল বাছিয়া লন।

আজ সময়ের বৈগুণ্য হেতু, মহৎ ও সাধু ব্যক্তির ভাবের বিপর্য্যয় হইয়াছে—তিনি চরণাশ্রিতা দাসীকে নষ্ট করিতে উদ্যত—নিরপরাধিনীর উপকারে বিমুখ—অবলার অজ্ঞানকৃত দোষ পরিত্যাগ করিরা গুণ গ্রহণে অনিচ্ছুক—নিজে সম্পদে থাকিয়াও দুঃখীর সাহায্যে বিরত।

হায় হায় আজ কি হলো—উন্মাদিনীর প্রলাপ কি শেষে পতি নিন্দায় পরি সমাপ্তি হইবে। আমি কি

যথার্থই পতি নিন্দায় প্রবৃত্তা হইলাম - আমার এই কথা গুলি কি নিন্দা হইতেছে ? এই দুঃখের কথা কি নিন্দাপদবাচ্য হইতে পারে ? এইরূপ নিন্দার কি কোন পবিত্র ও সত্যকারণ আছে ?

যখন এক সহানুভূতির অভাবে তাহার সহিত মতের রুচির, প্রবৃত্তির ও মনের আর মিল নাই, তখন আমি তার, তিনি আমার দোষ দেখাইতে পারেন, ইহা নিন্দ শব্দবাচ্য হইলে উপায় নাই। এই কারনেই এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নায়ক, প্রবর্ত্তক, প্রচারক—অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া থাকে—এক মতাবলম্বী চিকিৎসক, অন্য মতাবলম্বী চিকিৎসকের অপ্রিয়ভাজন হইয়া থাকেন—আহার বিহার সীমাবদ্ধ হিন্দু, যথেচ্ছাচারী সর্ব্বভূককে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে—শিক্ষিত সমাজ অশিক্ষিত সমাজকে ঘৃণা করে। এই জন্যই যিনি কোন নূতন বিষয়ক সত্য, নূতন সংস্কারাদি প্রচার করেন বা অবতারণা করেন, তাঁহাকেই অল্প বা অধিক, সাক্ষাতে বা পরোক্ষভাবে পরচর্চ্চা, অন্যের দোষ কি নিন্দা করিতে হয়—তদ্ধেতু চৈতন্যদেব, শঙ্করাচার্য্য, মহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাত্মারা এবং ইতিহাস লেখক, জীবন চরিত্র লেখক, টিকাকার গ্রন্থ সমালোচনকারী মহোদয়গণ অন্যের দোষ চর্চ্চা, ভ্রমাদি দেখা বা নিন্দা করিতে বাধ্য হন। এরূপ স্থলে

তাহাদের পরচর্চ্চাকে নিন্দা ও তাহাদিগকে নিন্দুক বলা যায় না। এরূপ নিন্দুকের নিন্দা নাই—আমারও দোষ নাই—নিন্দা করিবারও কোন কারণ নাই।

তাই বলি যদি কোন ব্যক্তি আমার হইয়া, আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া—অন্যের নিকট সেই উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, এবং অন্যকে সাবধান করিবার জন্য চোরের গুণকীর্ত্তন করি, তাহা হইলে কি চোরের নিন্দা করা হইল? আমি ঠকিলাম, জগৎ না ঠকে, এজন্য জগৎকে সতর্ক করিলে কি পরনিন্দা করা হয়! কঠিন পুরুষ জাতির কাল্পনিক রোদনে অবলাকুল ডুবিয়া, ভাসিয়া, না যায়, একথা বলিলে জাতিবিদ্বেষ হেতু পুরুষের নিন্দা করা হইল না—জগতের হিতার্থে সরল মনে অকপটভাবে সত্যের সীমা উল্লঙ্ঘন না করিয়া যাহা বলা হয়, তাহা নিন্দা নহে, যেমন সত্যের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রশংসা না করিলে চাটুবাদ হয় না।

কিন্তু প্রেম ভক্তিতে এ কথা খাটে না। প্রণয়ীর নেত্রে, প্রেম-পাত্রের রূপগুণাদি সত্যকে অনেক দূর ফেলিয়া অগ্রসর হয়। ভক্তি-বারি বিগলিত হৃদয় ভক্তিভাজনকে, প্রেমরসশিক্ত হৃদয় প্রেমাধারকে সত্যের অনেক উচ্চে স্থান দিয়া থাকেন—ইহাতে জগতের ক্ষতি নাই, সুখের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস নাই।

আমার স্থান অনেক উচ্চে ছিল, অনেক উচ্চাশা করিয়াছিলাম; তাই উচ্চতর স্থান হইতে নিপতিতা হইয়া অধিক আঘাতিতা হইয়াছি। প্রথম হইতে যদি ভাবিতে পারিতাম, যে সূর্য্য কেবল পদ্মিনীকান্ত নহেন—ইনি দিননাথ ও উষামণি—চন্দ্রদেব কেবল নিশামণি নহেন—ইনি কুমদীনাথ ও রোহিণী বল্লভ, তাহা হইলে আজ সতিনী-তাপিনী উন্মাদিনী হইয়া, প্রলাপ বাক্যে "কে কার" বলিয়া জগৎকে বিরক্ত করিতাম না।

যখন আমাদের উভরের মধ্যে সকল বিষয়ে ঐক্য ব্যক্য ছিল, মনে প্রাণের, রুচি প্রবৃত্তির বস্ত্রসম গাঁথনি ছিল—তাঁহার হাঁসি আমি বুঝিতাম, আমার হাঁসি সে বুঝিত—তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, আমি সব দেখিতে পাইতাম, সে চক্ষু বুজাইয়া আমার অন্তঃস্থল সব দেখিতে পাইত—তখন আর কিছু ভাবিবার অবসর ছিল না, হৃদয়ে স্থান ছিল না, মনের সময় ছিল না। সে সুখের প্রাণ, এখন আর এ দুঃখের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চায় না—মধুহীনা কুসুমে ভ্রমর আর বসিতে চায় না—তাঁহার আশ্বাসবাক্য ছলনায়, আশা ভরসা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল—তাই সেই পূর্ব্ব কথা, পূর্ব্ব ব্যবহার, পূর্ব্বের গুণ মনে করিয়া নীরবে থাকিতে পারি না। অবহেলার কষ্ট সহ্য করিতে পারি না—

সেই জন্যই পূর্ব্বকার যত্ন, স্নেহ আদরের কথা বলিয়া ফেলি—পূর্ব্ব ব্যবহারের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া থাকি। কোন মহাকবি (সেক্ষপীয়ার) বলিয়াছেন "যে আমার সুনামটী অপহরণ করে, সে স্বয়ং ধনবান হয় না কিন্তু আমাকে প্রকৃত দরিদ্র করে"; আমি তাঁহার প্রিয় পাত্রী, অনুরাগ ভাজন আর নাই; সুতরাং আমার সুনামটী অপহৃতা হইয়াছে, তাই দারুণ যাতনায় এই খেদোক্তি প্রকাশ পাইল।

নতুবা সতীর নিকট পতির কোন দোষ ঘাট থাকিতে পারে না—দাসীর কাছে প্রভুর কোন অপরাধ নাই। আমার নিকট তিনি মহৎ—আশ্রিতার নিকট আশ্রয় দাতা মহৎ—ক্ষুদ্র লতিকার নিকট পাদপ মহৎ—জীবন্মৃতার নিকট প্রাণদাতা মহৎ—কেবল আমার দুঃসময় হেতু, আমার প্রাণ-মিহির আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে আলোকিত করিতে পারিতেছেন না—মহৎ ও সাধুর ইচ্ছা চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও কোন ফল দেখাইতে সক্ষম হইতেছেন না—কপালের উপর চাপা পাথর খানি পবনদেব স্থানান্তরিত করিতে পারিতেছেন না। জলধর চাতকিনীকে জল দিবার জন্য দাঁড়াইতে চান—প্রবল কুজ্‌ঝটীকা তাঁহাকে স্থির হইতে দেয় না; ইহাতে জলধরের দোষ নাই চাতকিনীর ভাগ্য—চন্দ্রদেব দেখা দিবার জন্য, নিশাকে উজ্জ্বল

করিবার জন্য উদয় হন, মেঘরাশি তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখেন; ইহাতে চন্দ্রমার দোষ নাই, নিশা ও দর্শকের ভাগ্য।

সেই ভাগ্য দোষে, সময় বিগুণ হইলে, মিত্রের দ্বারায় শক্রর কার্য্য ঘটিয়া থাকে—বাণবিদ্ধ মৃগের দেহ-শোণিতই মৃগের পলায়নের পথ নির্দ্দেশক ও দেহনাশের মুলীভূত কারণ হইয়া থাকে—যে তপনকর নিশাকালে চন্দ্রদেবকে উজ্জ্বল করেন, সেই সূর্য্যরশ্মিই দিবাভাগে চন্দ্রমণিকে অনুজ্জ্বল করিয়া থাকেন। তাই ভাবি কপাল ভাঙ্গিলে, আত্মীয় পর হইয়া যায়। যিনি ভাল বাসেন, যাহার দ্বারায় সাহায্য হয়, তিনি ভাল আর বাসেন না—আর সাহায্য করেন না—উত্তপ্ত প্রাণে আর শীতল ছায়া দিতে চান না—সতিনী-তাপে-তাপিতা আজ ছায়া না পাইয়া এত কাতরা হইয়াছে।

আজ ছায়া না পাই কেন?—এ জগত যে ছায়া-বাজি—মানবের দেহই যে ছায়াযুক্ত—তবে ছায়া না পাই কেন? ছায়ার জন্যই সব—গৃহ, কুঠীর, বৃক্ষ পর্ব্বত সকলই ছায়ার জন্য। এই ছায়ার জন্যই লতিকা তরুবরকে আশ্রয় করে—ভিক্ষুক দাতার দ্বারে, দুঃখী ধনীর নিকট, বিপন্ন দয়ালু পরোপকারীর নিকট, সন্তপ্ত-হৃদয় সহৃদয় বন্ধুর নিকট, আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

থাকে—সেই ছায়া পেলুম না—দুঃখের জীবনে সুখের ছায়া পেলুম না।

যে ছায়ায় জগত আবৃত বলিয়া, সকলে আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না—যে ছায়ার জন্য চন্দ্র সূর্য্য রাহুগ্রস্থ—যে ছায়া হৃদয়ে পড়িলে, হৃদয়কে তিমিরাবৃত করিয়া থাকে—সুখের জীবনে যে দুঃখের ছায়া পড়ে, সেই ছায়াতে আজ হৃদয় গুরুগুর করিতেছে, সমস্ত দেহ কম্পিত হইতেছে—তাই হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে—নচেৎ কুসুমের কীট, মুদ্রিত কুসুমেই আবদ্ধ থাকিত—কুসুম কালে শুখাইয়া যাইত, ঐ সঙ্গে কীটও যাইত, বাহির হইতে পারিত না—কিন্তু এ সামান্য কীট নহে, বজ্রকীট—ইহাকে লুকাইয়া রাখিবার কোমল কুসুমের ক্ষমতা নাই—সিন্ধুনারীর ঘূর্ণিত-বক্ষ-উচ্ছলিত বারি বাঁধিয়া রাখিবার উপায় নাই, তাই “কে কার” বা “উন্মাদিনীর প্রলাপ” আজ জগতে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

—):০:(—

স্বপ্ন-বিহ্বলতা।

মনে সর্ব্বদা যাহা আন্দোলন করা যায়—হৃদয় মুকুরে অনুক্ষণ যাহা প্রতিফলিত হয়—জীবনের যেইটা প্রধান লক্ষ্য, বাঞ্ছিত রত্ন—তাহাই প্রায় স্বপ্নে দেখা যায়। এই স্বপ্ন সুখের হইলে, জীবন অন্ধকারে বিজলীর খেলা দেখিতে পাই—আর দুঃখের হইলে সেই অন্ধকার দ্বিগুণিত হইয়া থাকে।

সকলের জীবনেই প্রায় এই স্বপ্ন-বিহ্বলতা ঘটিয়া থাকে—এই স্বপ্ন-সাগরে কোন না কোন সময়ে সকল-কেই স্নান করিতে হয়। অনেকে স্বপ্ন-কথা বিস্মরণ হন, আমি ভুলিতে পারি না—প্রত্যহ যাহা দেখি, তাহা কেমন করিয়া ভুলিব—ভুলিলে আর কেমন করিয়া বাঁচিব? সুখের স্বপ্ন চিহ্ন একদিন মিলাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের দাগ শীঘ্র মিলায় না—সাদার উপর সাদা দাগ সর্ব্বদা লক্ষ্য পথে আসে না, কিন্তু সাদার উপর কাল দাগ দেখিবা মাত্রই নয়নগোচর হইয়া থাকে—আবার সেই কালদাগের উপর, কালদাগ পড়িলে তাহা আর মিলাইতে পারে না—তাই স্বপ্ন কথা সব মনে

অঙ্কিত হইয়াছে, হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, ভুলিতে চাহিলেও ভুলিবার উপায় নাই।

স্বপ্নে একদিন দেখিলাম,—দুঃখের পৃথিবী ছাড়িয়া এ হতভাগিনী সুখের স্বর্গে গিয়া নির্ম্মল আনন্দ, বিমল সুখভোগে তাপিত মন প্রাণকে সুশীতল করিতেছে। সাধারণ একটী কথা আছে যে "ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধানভানে" আমার ভাগ্যই তাহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ। একদিন অকস্মাৎ একটী রোদনধ্বনি, স্বর্গ-ভেদ করিয়া আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—আমার ইহজগতের পতির ক্রন্দন স্বর আমি চিনিতে পারিলাম—আমার বিরহের কাতরোক্তি আমি বুঝিতে পারি-লাম—তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে সুখদুঃখ উভয়ের একটী তরঙ্গ খেলিতে লাগিল।

প্রেমিকের হৃদয়ে একটী বাসনা সময়ে সময়ে বিদ্যু-দ্দামের ন্যায় উদয় হয় যে " মরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় যে তুমি আমার জন্য কি কর " কিন্তু অঘটন ঘটিবার নয় বলিয়াই, হৃদয়ের সাধ অন্তরে লয় পাইয়া থাকে। স্বর্গবাসিনী হইয়া জগতের এই দুরাশা আজ আমার সফল হলো—পতিপ্রাণার বিরহ, পতিকে যে কত কাতর ও মর্ম্মাহত করে তাহা দেখিতে পাইলাম, জানিতে পারিলাম। অক্ষয় স্বর্গবাসীরাও এই সুখের জন্য লালায়িতা; কিন্তু জন্ম-জরা-মৃত্যু-হীন দেশে এ

সুখাশা পূর্ণ হইবার উপায় নাই—তাই বলি স্বর্গবাসীরাও যে সুখ পান না, সেই সুখ হিল্লোলে প্রাণ আজ দুলিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিলাপে দুঃখের তরঙ্গ ও উঠিল—হৃদয় আঘাতিত, মন ব্যাকুল, ও প্রাণ চঞ্চল হইল। স্বর্গবাসীদের হৃদয়েও দুঃখের বেগ সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে; তাই শ্রীবৃন্দাবনের দুঃখ দেখিয়া, মহর্ষি নারদের হৃদয় গলিয়াছিল—ভক্তের দুঃখে কষ্টে ভগবানেরও মন চঞ্চল হইয়া থাকে—আমি কোন ছার?—যে কোন রূপ দেহ যতদিন ধারণ করিতে হইবে, সুখ দুঃখের অধীন ততদিন থাকিতে হইবে। আমি স্বর্গসুখ ত্যাগ করিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা করিতে মর্ত্তে আসিয়া বলিলাম, "গুণমণি! আমি তোমাকে ভুলি নাই—আমার সরল "প্রণয়ে অসরল ব্যবহার নাই—আমি তোমাকে দুঃখ-"সাগরে স্বইচ্ছায় ফেলিয়া পলাইয়া আসি নাই—থাকিতে "চাহিলেও থাকিতে পাইলাম না—যে যায় সে কি আর "স্বইচ্ছায় ফিরিতে পারে—অক্ষম জনের দোষ গ্রহণ "করিও না—বৃথা রোদনে আমাকে আর স্বর্গসুখে বঞ্চিতা "করিও না—এ জগতে যাহা আর পাইবে না, তাহার "জন্য আজীবন আর শোকতাপিত হইও না—শ্রীরামচন্দ্র "স্বর্ণসীতা লইয়া পুনর্ব্বার সংসারী হইয়াছিলেন—এত "ব্যাকুল হইও না, মনকে স্থির কর, ধৈর্য্যধারণ কর"।

আমার স্বপ্ন ঘোর ভাঙ্গিল, চাহিয়া ভাবিলাম "আমার প্রতিমূর্ত্তি-স্থানে—আমার প্রতিনিধি লইয়া তিনি সুখের নূতন সংসার পাতিয়াছেন।" আমাকে মরিয়া দেখিবার আর কিছু বাকি রহিল না—জীবিত দেহে সমস্তই দেখিলাম, সকল সাধও মিটিল। তখন বুঝিলাম স্বর্গ হইতে অনেক দিন নামিয়াছি—স্বপ্নে মাত্র সেই অবনতির ছায়া দেখিতে পাইলাম—কেবল স্বর্গ হইতে সংসারে আসি নাই—বিজন-বাসিনী হইয়াছি। যাহার জন্য আমি স্বর্গসুখ ত্যাগ করিতে চাই—সে কি আমার জন্য, জগতের অতি সামান্য সুখ ত্যাগ করিতে পারে না?

প্রাণবল্লভ! যে কঠিন হলাহলে এ হৃদয় জর্জ্জরিত করিলে, এ বিষের জ্বালা আর কাহারও হৃদয়ে জ্বালাইও না—এ জ্বালা ধুইবার নয়, মুছিবার নয়, নিবাইবার নয়, যাইবার নয়। হৃদয় রঞ্জন! চন্দন বৃক্ষে যে কালসর্প বাস করে তাতো আগে জানিতাম না—মায়াময়! তোমার হৃদয় যে পাষাণে গঠিত তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। প্রিয়বর যখন তাহার প্রিয় বস্তুর মায়া ত্যাগ করিলেন, তখন তাহার সকল বস্তু আজ ধ্বংস করবো—তাহার জন্য কাতর নয়নকে আজ ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করবো—তাহার মোহনমূর্ত্তী অঙ্কিত এ হৃদয়কে ভস্মীভূত করবো—তাহার

জন্য ব্যাকুল প্রাণকে আজ নিঃশেষিত করবো—তাহার সেবার কারণ যে এই দেহ, তাহাও অগ্নিতে আহুতি দিব। দিব দিব তো বলিতেছি—দিতে পারি কই? পাপের ভয়ে—ধর্ম্মের ভয়ে, দিতে পারি কই?—পাছে এ দগ্ধদেহের অনলে তাহার সুখশীতলতার বিঘ্ন হয়, এ প্রাণ ত্রিজগৎ ঘুরিয়া হাহাকার রবে তাহার গুণকীর্ত্তণ করিলে. তিনি আন্তরিক কষ্ট পান—এই আতঙ্কে দিতে পারি কই—আর এত দুঃখ কষ্টই বা সহ্য হয় কই? আমার সুখের দীপটী আজ নৈরাশ্য-নির্ব্বাত কন্দরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে—আমার সকল আশা শিথিলমূল হইয়াছে—এ সংসারে আমাকে "আমার" বলিবার লোক থাকিয়াও নাই—এ সংসারে আমার আর স্থান নাই—আমার কি হবে?

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে অবলার জীবন রক্ষা করিতে জগতের আরাধ্য নিদ্রাদেবী আসিয়া দেখা দিলেন। তাপিনীর তাপ তিরোহিত করিতে—দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে—পাপীকে দুশ্চিন্তা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এমন দয়াবতী ও ক্ষিপ্রহস্তা আর কেহ নাই। ইহাঁর ক্রোড়ে স্থান পাইলে, প্রাণের পিপাসা বিদূরিত হয়—পরিশ্রমের শ্রান্তি দূর হয়—হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত হয়। এই দেবীর প্রভাবে

স্থান, সময় ও পাত্রাদির ভেদজ্ঞান রহিত হয়—তাই রাজাধিরাজ মৃত্তিকা শয্যাতে শয়ন করিয়াও কষ্টানুভব করেন না—মাতা পুত্র-শোক ভুলিয়া থাকেন—মানী অপমান বিস্মরণ হন—বালক ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট বোধ করে না—আর, আর সতিনী-তাপিনীর মর্ম্মদাহন-ক্রিয়া স্থগিত থাকে। নিদ্রাদেবীর কৃপায় আমার দগ্ধহৃদয়ের জ্বালা থামিল—যতক্ষণ দেবীর প্রগাঢ় দয়া ছিল, ততক্ষণ আমারও কষ্টের অবসান হইয়াছিল।

তাহার পর যে স্বপ্ন-প্রসাদে লোকে বাঞ্ছিত দ্রব্য লাভ করে—মরুভূমে জল পায়—আশাতীত সুখলাভ করে, সেই স্বপ্নবলে, যাহাকে হারাইয়া উন্মাদিনী, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম—দেখিবামাত্রই তাঁহার চরণযুগল ছাঁদিয়া ধরিলাম, পাছে আবার কেহ কাড়িয়া লয়, এই ভয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়া, লোকালয় ত্যাগ করিয়া, নির্জ্জন বনে পালাইবার জন্য ছুটিলাম—আর ছাড়িব না, কাহাকে দেখিতে দিব না, চক্ষের অন্তর করিব না, ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, আর ঘুমাইব না, এই স্থির করিয়া ফণিনী মণি লইয়া ছুটিল। যাহার নিজদেহ বহন করা ভার হইয়াছিল, সে মণি হারাইবার ভয়ে, মণিকে বক্ষে বাঁধিয়া, আজ অক্লেশে ছুটিতে পারিল—পতিই সতীর দেবতা, তাই দেবতার প্রসাদে বুঝি শক্তির উপচয় হইল।

অদূরে একটী সুন্দর উপবন নয়ন গোচর হইল—ইহার বৃক্ষ লতা, তৃণ পাতা, ফুল ফল, সব চাঁদের আলোতে আলোকিত হইয়াছে—মধুর বসন্তের মলয়-হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া পথিকদের ডাকিতেছে—সুখদ যামিনীতে পিকবালা পঞ্চস্বরে মধু বর্ষাইয়া ডাকিতেছে—মৃদুল গন্ধ-বাহী পবন আস্তে আস্তে গা ছুঁইয়া ডাকিতেছে। উভয়ে আনন্দে নির্জ্জন উপবনে প্রবেশ করিলাম—চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম—আমার মতন সকলেই মনের মতন প্রিয়বস্তু লাভ করিয়াছেন। বসন্তরাজ সুশোভিতা রসপূর্ণাধরাকে পাইয়া সুখী হইয়াছেন—পিককুল সহকারে মধুময় মুকুল পাইয়া আনন্দিতা হইয়াছে—মলয় মারুত মধুভরা কুসুমকামিনী পাইয়া মত্ত হইয়াছে—তরুগণ রসাল নব নব পত্র পরিয়া সুচারুবেশে ভূষিত হইয়াছে—আর আমি হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বাহিরে ভিতরে সুন্দর সাজে সাজিয়াছি, সুখের সাগরে সাঁতার দিতেছি—আমার চতুর্দ্দিকে অমৃতধারা বর্ষণ হইতেছে।

আজ আমি নূতন প্রাণ পাইয়াছি—নব মধুর ভাবে হৃদয় মন বিভোর হইয়াছে—তাই অগ্রে যে বসন্ত-রাজকে কঠিন নির্দ্দয় ভাবিয়াছি, আজ বৃক্ষাদিকে রসাল করাতে তাঁহাকে কোমল দয়াবান বলিতেছি—অবলা-নিধনে উদ্যত দেখিয়া, যে মলয়-মারুতকে অস-

জ্জন ভাবিয়াছিলাম, সেই কুসুম সৌরভবাহী জগত-প্রাণকে আজ সজ্জন বলিয়া অনুমিত হইতেছে—বিরহে যাহা ঘৃণিত ও কষ্টপ্রদ ছিল, আজ তাহা বাঞ্ছিত, সুখদায়ক ও সুন্দর বোধ হইতেছে।

ক্রমশঃ উভয়ে একটী উপবন মধ্যে অগ্রসর হইয়া, সম্মুখে একটী সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইলাম—সরোবরে সরোজ কুমুদাদি পুষ্প দেখিতে পাইলাম—স্বচ্ছ-নীরে চন্দ্রের ও তারকাকুলের প্রতিবিম্ব খেলা দেখিতে পাইলাম। সেই সরোবরের প্রস্তরগঠিত ঘাটে উভয়ে গিয়া উপবেশন করিলাম। আমাদের দেখিয়া কেহ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে কি না?—কোনস্থানে লুকাইয়া আছে কি না?—এই ভাবিয়া চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম—সুসময়ে আশঙ্কার কিছুই নয়নগোচর হয় না—মন্দ কিছুই নিকটে আসিতে পারে না—তাই দেখিলাম বাসন্তী লতিকা রসিক তরুর বক্ষে উঠিয়া দুলিতেছে, মলয়-মারুত কুসুমবালার সহ ক্রীড়া করিতেছে, অলিরাজ নবোন্মিলিত রসাল বকুল-মুঞ্জরী বেড়িয়া বেড়িয়া ঘুরিতেছে—গুণগুণ রবে গান করিতেছে, আর মুঞ্জরীর উপর গিয়া বসিতেছে—নবীনা মুঞ্জরী প্রাণের ভ্রমরকে পাইয়া, এক হইয়া সোহাগে কাঁপিতেছে—যুগল-মিলনে নাচিতেছে। আমি কম্পিত হস্তে, নাথের কম্পিত

অধরে অঙ্গুলী দিয়া, ভ্রমরের প্রতি দৃষ্টি করিতে নির্দ্দেশ করিলাম। তিনি দেখিয়াই, আমার উপর তীব্র—কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, পরক্ষণেই হাঁসিয়া বলিলেন "আর একটু চাহিয়া থাক।" ইহার ভাবার্থ আমি তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, অথচ তাঁহার আজ্ঞাধীনা হইয়া, একমনে ভ্রমর পানে চাহিয়া রহিলাম—দেখিতে দেখিতে ভ্রমর সেই মুঞ্জরী ত্যাগ করিয়া, অন্য একটী মুঞ্জরীতে গিয়া বসিল—পূর্ব্বরূপ যত্ন ও সোহাগের সহিত এক হইয়া মিশিল—তৎক্ষণাৎ সে লজ্জাহীনা মুঞ্জরী খেলিতে, দুলিতে, নাচিতে লাগিল—পরিত্যক্তা মুঞ্জরী, জীবহীন প্রস্তরের ন্যায় স্থির হইল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম, বিস্ফারিত ও নির্নিমেষ নয়নে—সেই মুখখানি পানে চাহিয়া দেখিলাম—অশ্রু দৃষ্টিপথ রোধ কবিল—তখন নয়নকে তিরস্কার করিয়া বলিলাম "অদর্শনের রোদন তোর ভাগ্যে চিরদিনই আছে, দর্শনে আর কেন কাঁদিয়া মর—এই সময়ের জন্য ধারা সম্বরণ কর—সকল সময়ে কি বৃষ্টিপাত ভাল লাগে?" এইরূপ নয়নকে ভৎর্সনা করিয়া, জল মুছিয়া আবার সেই অমিয় বদন খানি পানে চাহিয়া দেখিলাম—আমার সমস্ত আতঙ্ক ও ভয় তিরোহিত হইল—তাঁহার নিকট আছি বলিয়া আবার আনন্দে গলিয়া পড়িলাম—পূর্ব্বকথা সব ভুলিয়া গেলাম।

সরোবরের একটী মুদিত ও কম্পিত কমলকে দেখাইয়া—ঈষদ্ধাস্যে নাথ আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "প্রণয়িণী! বল দেখি, কমলিনী কম্পিতা কেন?"

আমি অমৃত সিঞ্চিত প্রাণে হাঁসিয়া উত্তর করিলাম, —"মলয় হিল্লোলের সহবাসে, সানন্দে কাঁপিতেছে"— পদ্মের বিরহ-কম্পন ভাবটি তখন আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না। সুখী দুঃখীর দুঃখ সহজে জানিতে পারে না,—বুঝিতে চায় না—আমার হৃদয়ে তখন সুখ-সম্মিলনের উজান বহিতে ছিল—সে সময়ে বিরহভাব মনে স্থান পাইল না, তাই বলিয়া ফেলিলাম "আনন্দে কাঁপিতেছে"।

তিনি বঙ্কিম কটাক্ষে একটু হাঁসিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ আনন্দের কারণ কি?" এ প্রশ্নের আমি আর কোন উত্তর দিতে পারিলাম না— সেই সময়ে অন্য কোন ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া, অল্প নীরস হাঁসি হাঁসিয়া ব্যগ্র স্বরে বলিলেন,—কুমুদিনীকে পতি ধনে বঞ্চিতা করিয়া পদ্মিনী, আজ মধুপকে হৃদয়ে লইয়া মুদিত হইয়াছে, তাই আনন্দে কাঁপিতেছে।"

আমার এখন সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল—এই শ্লেষের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হইল—অন্তর কাঁপিল,—বাষ্পাকুলিত

নেত্রে গদ্গদ-স্বরে বলিলাম,—"পদ্মিনী-নাগর" বলিতে ভ্রমরকেই বুঝায় সুতরাং ভ্রমরের উপর অগ্রে পদ্মিনীর দাবি খাটিতে পারে।

তিনি হাঁসিয়া বলিলেন,—"ঐরূপ কল্পনাপ্রসূত অর্থ সর্ব্বত্রে খাটিতে পারে না। ভাবুকের—কবিদের কথায় কি না পাওয়া যায়? তাঁহাদের ভাবের তরঙ্গে কি না ভাসিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি বিষয় শুনিতে, দেখিতে ও ভাবিতে যেমন, বুঝিতে তেমন নয়—স্থল বিশেষে প্রকৃত অর্থাগমে অনেক বাধা বিঘ্ন মনে উদয় হইয়া থাকে।

সুধাকর যদি তারাপতি, তবে তারকাকুল পূর্ণিমা রজনীতে উজ্জ্বল না হইয়া অনুজ্জ্বল হয় কেন?—আর সুধাকরহীন অমানিশাতে তারকারাজি অধিক উজ্জ্বল-রূপে সজ্জিতা হইয়া হাঁসিতে থাকে কেন? অমানিশাতে কুমুদিনাথ বিরহে কুমুদিনী হাঁসে কেন? কমলিনী যদি দিননাথকে দেখিয়াই হাঁসিয়া থকেন, তবে বর্ষাগমে সমস্ত দিবা দিনমণি মেঘাবৃত থাকিলেও কমলিনী হাঁসিতে থাকেন কেন? ফুলকুলকে আলোতে হাঁসিতে দেখি, আঁধারেও হাঁসিতে দেখি? তাই বুঝি ভাব-কল্পনা-স্রোতের কূলকিনারা নাই—একূল ওকূল দুকূল নাই—যখন যে কূলের দিকে টান ধরেন, সেই কূলকেই নিজগর্ভে মিশাইয়া লন। এজন্য কবি ও ভাবুক শৈবলিনীকে

কখন কাঁদিতে, কখন বা হাঁসিতে দেখিয়া থাকেন— বায়ু স্বরে কখন হো হো, কখন হু হু, আর কখন হায় হায় শব্দ মিশাইয়া, শুনিয়া থাকেন—নারীকণ্ঠে কখন সুধা, কখন বা বিষভাণ্ড বাঁধিয়া দেন—রমণী প্রেমে স্বর্গ-নরক দুই নির্ণীত করেন—পুরুষকে কোন সময়ে পাষাণ, কোন সময়ে লতার আশ্রয়তরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—কুমুদিনীর সহিত রোহিণী-নাথের চক্ষের দেখা দেখাইয়া, দুই জনকে স্বর্গ-মর্ত্ত জুড়িয়া এক কাল্পনিক প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া দেন।

আমি তাঁহার ভাব বাক্যবিন্যাসাদি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম—কথাগুলি আমার কর্ণে বাণবিদ্ধ, হৃদয়ে শেলাঘাত করিতে লাগিল—তাই এই স্রোত ফিরাই-বার জন্য, আমি সত্রাসে, সোৎসুখ দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিলাম "নাথ! ভাবুক না হইলে না কি কেহ কবি হইতে পারে না?" তিনি বিদ্রূপ হাস্যে বলিলেন—সর্ব্বত্রে এ কথা সত্য নহে। কোন ভাবুকের বাক্‌পটুতা সংযোগ, রচনাশক্তি কি বিদ্যাবুদ্ধি অধিক না থাকায় মনের ভাব মনেতেই থাকিয়া যায়, প্রকাশ পায় না—আর কেহ প্রকৃত ভাবুক না হইয়াও, ঐ সকল গুণের বলে, ভাবের তরঙ্গ দেখাইয়া জগতকে স্তম্ভিত করিতে পারেন।"

আমি ভাবিলাম এ কথা সব অপ্রকৃত নহে—

নিজের মনের অবস্থা ভাবিয়া বুঝিলাম, ভাবুক সময়ে সময়ে নিজের ভাবে বিভোর হইয়া থাকে—মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকে না এবং সকল কথাও পাওয়া যায় না, তাই "না জানি-কেমন," "কেমন করিয়া বলিব কেমন" ইত্যাদি কথা প্রয়োগ করিতে হয়। সময়ে সময়ে যতটুকু মনের ভাব কথাতে জানাইতে পারা যায়, তাহাও জানাইবার ক্ষমতা থাকে না—এই কারণেই আজ ঐ সকল কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। আমি কেবলমাত্র নির্ব্বাক হইয়া, সজল নেত্রে নিস্পন্দভাবে, সেই চাঁদমুখখানি পানে চাহিয়া,গরলামৃত মিশ্রিত কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম।

নাথ পুনর্ব্বার গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"এই জন্যই সচরাচর পুরুষের দুঃখ শোক- "বেগ প্রবলতর হইলেও, রমণীর গাথা-বিনান-দুঃখ- "শোকের কথার সহিত তুলনা করিলে, অপ্রবল বোধ "হইয়া থাকে—তাই নারীজাতির কাতরতা অনেক "স্থলে অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া অনুমিত হইতে "পারে। সামান্য কষ্টে অনাদরে রমণীর চক্ষে জল "আসিয়া থাকে—অনেক সময়ে রৌদ্রের উত্তাপেই "কমল শুষ্ক হইয়া থাকে—স্ত্রীলোক কেবল আপনার "সুখ দুঃখ, নিজ সংসারের সুখ দুঃখ লইয়া ব্যতিব্যস্ত "হন—নারীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে কোনরূপ আবেগ কিছুমাত্র

"অধিক হইলেই—তাহা উছলিয়া পড়িয়া থাকে। "একটী কথা আছে 'অল্প শোকে কাতর, আর "বিস্তর শোকে পাথর"—এই কাতরতাই শোক দুঃখের স্বল্পতা সপ্রমাণিত করিয়া থাকে, দেখাইয়া দেয়।"

যাহার জন্য উন্মাদিনী, তাহারই কথাতে এইরূপ নিদারুণ আঘাতিতা হইয়া—কিয়ৎক্ষণ অর্দ্ধজ্ঞানচৈতন্য-হীনা হইয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম—যাহাতে সহজে দাগ বসে না—যাহা সহজে নুইতে চায় না—অশ্রুজলে ভিজাইয়া রাখিলে, যে সরস ও কোমল হইতে জানে না—সেইতো পাথর—পাষাণ। ভাবিতে ভাবিতে একটা প্রশ্ন করিবার জন্য চাহিলাম—চাহিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল—এই সময়ে আমার মহানিদ্রা না আসিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। এ চির-দুঃখিনী স্বপ্ন প্রভাবে কাল্পনিক সুখও কিছুক্ষণ ভোগ করিতে পারিল না—হায় হায়! যাহার হৃদয়ে দিবারাত্র বিষের বাতি জ্বলিতেছে—বৃশ্চিক বিষের তাড়নায় যাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে—যে রোগের প্রবল যাতনায় ছট্‌ফট্ করে—যাহার পিপাসায় ছাতি ফাটে তাহার উপর নিদ্রাদেবীর কৃপাদৃষ্টি হয় ন। অদৃষ্ট যাহার প্রতি নির্দ্দয়, কেহ তাহার প্রতি সদয় হয় না—

তাই আমার স্বপ্নের সুখও স্থায়ী হইল না—নিদ্রাদেবীর দয়া পাইলাম না আমার যাতনা যাইল না।

কি দুর্ভাগ্য! এ জনমে আমার কিছুই হইল না;—ফুল ফুটিল, মধুপান হইল না—দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়িল; চঞ্চলা চপলা চকিতে চতুর্দ্দিক চমকিত করিয়া, অনন্ত নীল নভঃস্তলে মিশিয়া গেল, দর্শকের দর্শনাশা পূর্ণ হইল না—চাঁদ উঠিল, দেখিতে না দেখিতে কাল মেঘের মধ্যে অন্তর্হিত হইল—চাতকিনীর সুধাপান তৃষা মিটিল না; সুখস্বপ্নের রেখা ইন্দ্রধনুর ন্যায় অবিলম্বে অদৃশ্য হইল—আমার কিছুই হইল না।

মর্ম্মপীড়িত স্বরে চীৎকার করিয়া চক্ষু মুদিলাম—কেন মুদিলাম? যদি আবার সেই সৌভাগ্যের কানন ও সরোবর দেখিতে পাই—সুখের ছায়া, আনন্দের সৌরভ, প্রাণের সর্ব্বস্ব আবার পাইয়া শীতল হইতে পারি কিন্তু এ দুর্ভাগিনী সেই স্বর্গীয় মনোহর উপবন আর দেখিতে পাইল না—সেই সুখের কানন মুহূর্ত্তেক মধ্যে দুঃখের অরণ্যে পরিণত হইয়াছে—তাই আজ এই বনে শীতারশ্মির কিরণ নাই, নীলাকাশ কালিমায় বিলেপিত, পুষ্প সুগন্ধহীন, সরোবর স্বচ্ছনীরবিহীন, সরোবরের কমল কুমুদ পুষ্পাদি সর্পমণ্ডিত, সমস্ত বনই কণ্টকজড়িত ও বায়ু উত্তপ্ত, ধূলিরাশিতে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

সেই বনে বাতছিন্না লতিকা, বজ্রাহত বৃক্ষাদি দেখিতে পাইলাম—আর, আর সেই বনে, নল-পরিত্যক্তা দুঃখিনী দময়ন্তীকে—শ্রীরাম-বর্জ্জিতা শোকাতুরা জনক-নন্দি-নীকে—দুষ্মন্ত-ত্যক্তা নিরপরাধিনী শকুন্তলাকে নয়নজলে ভাসিতে দেখিলাম—বিষাদ-সাগরে ডুবিতে দেখিলাম।

মধুরতা, শীতলতা, নবীনত্ব, উজ্জ্বলতা, নির্ম্মলতা, মনোহারিত্ব কিছুই আর নয়নগোচর হইতেছে না—যে দিকে চাই—উল্কাপাত, শিলাবৃষ্টি, প্রবল ঝটিকা, হাহাকার রব দেখিতে ও শুনিতে পাই। অবলার প্রাণ ভয়ে আলোড়িত হইতে লাগিল—ভাবিলাম আমি আজ কোথায়? কে যেন আমার কাণে কাণে আসিয়া বলিল "দুঃখিনীর দেশে, তাপিনীর আশ্রমে, পাগলিনীর শাস্তি গৃহে"—প্রাণ চমকাইয়া উঠিল, কাতর প্রাণে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া ডাকিলাম "ভগবন্!! দয়াময়!! কোন অপরাধে আজ উন্মাদিনী শাস্তি পায়?—দয়া পাইবার অধিকারিণী নহি—তাই কোন প্রত্যুত্তর পাইলাম না—চক্ষের উত্তপ্ত বারি বুক ভাসিয়া পড়িতে লাগিল—উচ্চৈঃস্বরে মনে যা আসিল তাই বলিয়া কাঁদি-লাম—তাই সতিনী-তাপিনীর বিলাপ আজ উন্মাদিনীর প্রলাপ রূপে পরিণত হইল।

অবলার কাতর প্রাণে আর কত সহ্য হইবে? হৃদয়েশ্বর হৃদয়কে পেষিত করিতেছেন—যিনি রক্ষক

তিনিই ভক্ষক হইয়াছেন, ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। লোক কথায় বলে "যে নারী সতীনে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে"—তাই আজ এই সব সহিতেছে, শোভা পাইতেছে। তাই অবশেষে দুঃখে বলি, চকোর বিধুর সুধা পান করুন—বাধা দিবার ক্ষমতা নাই—কিন্তু চকোরিণীকে ভুলিবেন কেন! নবঘন চপলাকে বক্ষে বাঁধিয়া রাখুন আপত্তি নাই—চাতকিনীকে শীতল জলদানে বঞ্চিতা করেন কেন?

চন্দ্রদেব রোহিণীকে পার্শ্বে লইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে জগতে সুধা ঢালিতে থাকুন—আর আর এই অভাগিনী দাসী কুমুদিনী, সুদূর স্থান হইতে তাঁহার পাদ পূজা করুক, তাহার চরণ দর্শন করুক—এই বাসনাটি যখন আমার সফল হইবার আর আশা নাই—তখন আর সংসারে থাকিব না। সংসারের সকল সাধ আমার ফুরাইয়াছে—তাই অন্তর্যামী মন স্বপ্নে আমাকে অরণ্য গমনে উপদেশ দিয়াছেন—তবে আজ বনবাসিনী হইব—বনে গিয়া এ প্রেমোন্মাদিনী বনের সকলকে শুনাইয়া বলিবে।

"স্বপত্নী অধীন স্বামি বধে উন্মাদিনী।
জগতে স্বপত্নী হয়, আর যেন না শুনি"॥

পূর্ব্ব কথা স্মরণে, এ সন্ন্যাসিনী, বনের গাছে গাছে লিখিবে।

"উদ্ভ্রান্ত পতির কথায়, ভুলিও না আর।
পুরুষ কঠিন অতি, মন পাওয়া ভার॥
পড়া পাখীর শেখা কথায় মন যদি যায় গলে।
শেষে দিদি কাঁদ্‌তে হবে, হাত দিয়া কপালে॥"

পাখী পুষিয়া, রাত্রিদিন অনাহারে বসিয়া শিক্ষা দিব।

"জ্বালা না সহিতে পেরে, বিজন বাসিনী।
হইল এ অভাগিনী ; সতিনী তাপিনী,
সতিনী বিষের জ্বালা, কে সহিতে পারে
মরণেও সুখ নাই, সদা আঁখি ঝোরে॥

লজ্জা ত্যাগে সকলের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিব।

"দিওনা দিওনা কভু মরমে যাতন।
প্রাণসম প্রিয়তমার গেলেও জীবন॥"

শেষে যে নয়-সংসারী নয় উদাসীন সমাজে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলাম—যে নির্দ্দয় সমাজের পক্ষপাতী নিয়মের জন্য, মনস্তাপে আজ "কে কার" ভাবিয়া উন্মাদিনী হইলাম, সেই সমাজের কর কমলে "বিষস্য বিষমৌষধম্‌" জ্ঞানে এই কে কার বা উন্মাদিনীর প্রলাপ সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম

সমাপ্ত।

উপসংহার।

—):০:(—

এ জগতে সময়ে সময়ে "অমৃতে গরল" উঠিয়া থাকে—কিন্তু আজ পতিপ্রাণা সতী উন্মাদিনীর প্রাণে পতির প্রেম বিকার "গরলে অমৃত" উঠিয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে এ সংসারে অন্য স্থলেও "গরলে অমৃত" উত্থিত হইতে দেখা যায়—যে ধর্ম্মহীন ব্যক্তি রোগ ভুগিয়া ও নানাবিধ চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া, অবশেষে রোগের জ্বালায়, দৈবকার্য্য দ্বারা বা দৈব-ঔষধ বলে, রোগমুক্ত হইয়া ধর্ম্মশীল হন, সেখানে গরলে অমৃত উঠিয়া থাকে—সংসারের প্রিয়তম বন্ধন-গুলি কাটিলে, মায়ার ঘোরে মন, প্রথমে হাহাকার করিয়া, শেষে যে অলীক সংসার ভুলিয়া, ভগবৎ চিন্তায় প্রগাঢ় রূপে নিমগ্ন হয়, এখানেও "গরলে অমৃত" উঠিয়া থাকে।

সাধক তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"সুখমে বাজ পঁড়ু দুখ্‌কে বলিহারি যাই।
অ্যায়সা দুখ্ আওয়ে যে—ঘড়ি ঘড়ি হরি নাম স্মরাই॥
"তুলসী ছুঁয়া যাইয়ে, যাহা আদর না করে কই।
মান ঘাটে মন মরে, রাম্‌কো স্মরণ হই॥

ইহাও গরলে অমৃত উঠিবার দুইটি আভাস মাত্র।

রোগ শোক, পরিতাপ অনুতাপ, ও যে সব কারণে সংসারে ঘৃণা, মনে বৈরাগ্য, প্রাণে বিবেক, আসিয়া উপস্থিত হয়—মন জগৎ ছাড়িয়া জগৎপিতার ধ্যানে নিমগ্ন হয়—অনিত্য, স্বার্থপর, অসার সমস্ত পরিত্যক্ত হয়—সেই খানেই "গরলে অমৃত" উঠিয়া থাকে।

পতি-প্রেম বিকার-গরল সংশোধিত হইয়া আজ যে বিষবটীকা প্রস্তুত হইল, তাহা উন্মাদিনীর বিষাক্ত রোগে, অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া, প্রকৃত জীবন দান করিল। স্বর্ণকে নির্ম্মল করিতে যেরূপ দহন ক্রিয়া প্রয়োজন হয়, আজ সেই দহন ক্রিয়া গুণে উন্মাদিনীর মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইতে লাগিল—কর্ম্মফল, ভোগে ক্ষয়িত হইতে লাগিল—ক্রমশঃ তাঁহার চক্ষুর চক্ষু ফুটিতে লাগিল। এজগৎবাসী অনেকেই যেরূপ চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া থাকেন, আমাদের উন্মাদিনীও এতদিন সেইরূপ চক্ষু থাকিতে অন্ধ ছিলেন।

চক্ষু থাকিলেই যে সব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। যে পদার্থের আকার ও রূপ, চক্ষু গোলকের কেন্দ্রীভূত হয়, তাহারই সত্তা মাত্র অনুভূত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—এই জন্যই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দেখিতে হইলে, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্য লইতে হয় এবং উহাদের দ্বারাই চন্দ্রের কলঙ্ক রেখাকে পর্ব্বত

রাশি ও শূন্যাকাশকে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণুপূর্ণ দেখা গিয়া থাকে।

দৃষ্টির গতি নানা প্রকারে সীমাবদ্ধ—এই সীমার বাহিরে সাধারণ চক্ষু আর দেখিতে পায় না,—আবার এই সাধারণ দৃষ্টি সর্ব্বজীবের সমান নহে—এজন্য অনেক জীব অন্ধকারে দেখিতে পায়, আলোতে দেখিতে পায় না—সুতরাং অন্ধকারে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং আলোক দর্শন কার্য্যের প্রধান অবলম্বন ও কারণ ইহা সর্ব্বস্থলে সমীচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না—তদ্রূপ চক্ষু চাহিলেই যে দেখা যায় এবং মুদ্রিত থাকিলেই যে দৃষ্টিরোধ হয়—ইহাও সর্ব্ব-স্থলে ঠিক নহে; কারণ স্থল বিশেষে চক্ষু মুদিয়া আমরা অধিক পরিষ্কার দেখিয়া থাকি।

এতদ্ভিন্ন মনের অবস্থা ও দেখিবার প্রণালী অনু-সারে একই বস্তুর রূপ ও ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে—এজন্য কুৎসিৎকে সুন্দর, ভালকে মন্দ, বলিয়া ভ্রম হয়—এই জন্যই "চক্ষু থাকিতে অন্ধ" কথাটী প্রচলিত আছে।

মনের একটী প্রধান সাধ "দেখিতে পাওয়া"—এজন্য গায়ককে দেখিতে না পাইলে—কথককে দেখা না গেলে, গান ও কথকতা শুনিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় না—সাধারণ একটী কথা আছে, "দেখিতে পাইলে

কেহ শুনিতে চায় না।" যিনি কি ভাবে দেখিতে হয়, তাহা জানেন না বা বুঝিতে পারেন না—যে বস্তু যে ভাবে দেখিতে হয়, তাহা দেখিতে পান না—যাহার সুনিয়মে দেখিবার ক্ষমতা নাই—তিনিই "চক্ষু থাকিতে অন্ধ।"

তাই বলি চক্ষুর চক্ষু না ফুটিলে—দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি না জন্মাইলে সাধারণ চক্ষুষ্মাণ হইয়াও সকলেই অন্ধ থাকেন। আজ তাই উন্মাদিনীর চক্ষুর চক্ষু ফুটিতেছে বলিতে হইল—কারণ উন্মাদিনীর চক্ষু হইতে সংসার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে—দর্শন শক্তি আর সীমাবদ্ধ কি তমসাচ্ছন্ন নহে, দৃষ্টিতে মায়া মমতার আর বৃথা আবরণ নাই—স্নেহ যত্নের আবিলতা নাই—অসারকে সারবান, অনিত্যকে নিত্য, কুপথকে সুপথ, শত্রুকে মিত্র, পরকে আপনার বলিয়া আর ভ্রম হয় না—এতদিনে উন্মাদিনীর প্রকৃত অন্ধতা বিদূরিত হইল।

বনবাসিনী উন্মাদিনী প্রস্ফুটিত ও প্রশান্ত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল যে নানাজাতীয় কোমলপ্রাণা লতিকা নিজ নিজ দেহভার তরুবরে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে—কালে লতা মৃতা ও শুষ্কা হইতেছে—আর লতাশ্রয় মহাবৃক্ষ অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—কোথায় বা শুষ্ক বৃক্ষে লতাদি জড়াইয়া উঠিতেছে, আর তরু সহ বিচ্ছিন্না হইয়া নিপতিতা হইতেছে—ভিন্ন ভিন্ন ফলপুষ্পাদি সময়ে জন্মিতেছে ও সময়ে লয় পাই-

তেছে। সময়ানুসারে বৃক্ষের পুরাতন পত্র রাশি ঝরিয়া পড়িয়া আবার নূতন পাতা জন্মিতেছে—যথাসময়ে শীত-গ্রীষ্মাদি ষড়ঋতু যাতায়াত করিতেছে এবং চন্দ্রসূর্য্য গ্রহাদি উদয় হইতেছে ও অস্ত যাইতেছে—পশু পক্ষী, জীবকুল জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিকায় প্রাপ্ত হইয়া, যথাকালে আবার ক্ষয় হইতেছে—জগতের কোন বস্তু, কোনরূপ যত্নে বা চেষ্টায় স্থায়ীভাবে রক্ষা করা যায় না। বৃক্ষ লতা গুল্মাদি মৃত হইতেছে, তাহাদের মঞ্জরী ও বিচি হইতে আবার সেই জাতীয় বৃক্ষাদি জন্মিতেছে—রাত্রিকালে অনেক গুলি পক্ষী এক বৃক্ষে আসিয়া একত্রিত হয়, প্রাতঃকাল হইলে কে কোথায় সব চলিয়া যায়—নিখিল জগত—কাল ও নিয়মের অধীন।

এই সকল দেখিতে দেখিতে উন্মাদিনীর দৃষ্টি ক্রমশঃই সতেজ হইতে লাগিল—অশ্রান্ত অবাধ দৃষ্টি ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল—বাহ্য জগতের আলো আঁধারে সে সূক্ষ্ম দৃষ্টির কোন প্রত্যবায় হইল না, কোন বাধা পাইল না।

উন্মাদিনী আজ নূতন দৃষ্টিতে অভিনব ভাবে সমস্ত জগত দেখিতে ও বুঝিতে লাগিলেন—যে ভাবে প্রকৃত পক্ষে দেখিতে হয়, তাহা এতদিনে শিক্ষা ও অভ্যাস হইতে লাগিল—তাই বলি উন্মাদিনীর চক্ষু আজ প্রকৃত চক্ষুদান পাইল।

এই জন্যই এই সব দেখিয়া উন্মাদিনীর সাধ পুরিল না। তাহার অতৃপ্ত দৃষ্টি, অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষা কোথায় কাহাকে দেখিবার জন্য যেন লুটাইয়া লুটাইয়া ছুটিতে লাগিল—এই লীলাখেলার লীলাময়কে জানিবার, বুঝিবার ও প্রাণের ভিতর দেখিবার জন্য—প্রেমভক্তি-সিক্ত মন প্রেমময়কে, ভক্তির আরাধ্য দেবকে পাইবার জন্য উর্দ্ধবেগে ব্যাকুল ভাবে ছুটিতে লাগিল।

যে ইহ জগতের পতির প্রেমলাভার্থে এত চঞ্চলা হইয়াছিল, সে নিখিল-বিশ্বস্বামীর দুষ্প্রাপ্য—অতুল্য প্রেমকণা লভিবার জন্য কেন না সমধিক কাতরা হইবে?? জগতের অকিঞ্চিৎকর ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখের জন্য যে নানাবিধ দারুণ ক্লেশভার লইতে বিমুখা না হয়, সে পরমার্থ রত্ন, চতুর্ব্বর্গ ফল ও নির্ম্মল স্থায়ী সুখ পাইতে কি সে পরাঙ্মুখা হইবে?? মায়ামোহের ফাঁদে পড়িয়া, যে ইহ সংসারে ঘুরিয়া মরে, মরুভূমে সরোবর খুঁজিয়া থাকে—সে মায়াময়কে অনুসন্ধান করিবার জন্য—মানস সরোবরের ভক্তি-সোপানে দাঁড়াইয়া, প্রেমপীযূষবারি পান করিবার জন্য—কেন না আকুল প্রাণে—ব্যাকুল হইয়া ছুটিবে??

আমাদের দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে তুলনা করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা নাই—তারতম্য প্রভেদ করা যায় না—ভাল মন্দ বাছিতে পারা যায় না- তাই অবোধ বালকের

ন্যায় উপরের চাকচিক্য, অদূরদর্শীর ন্যায় বর্ত্তমান সুখ ও ভোগ, দেখিয়া থাকি এবং লভিতে যত্নবান্ হই। আজ উন্মাদিনী পুনর্ব্বার পতি প্রেম সোহাগিনী হইলে, সেই সুখভোগেই অন্ধ থাকিতেন—চক্ষুর চক্ষু আর ফুটিত না—তাই বুঝিতেছি—উন্মাদিনীর ভাগ্যবলে—পতিপ্রেম-বিরহ গরলে আজ অমৃত উৎপাদিত হইল।

স্বপ্নযোগে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া লোকে যেমন চিৎকার ও ক্রন্দন করিয়া থাকে, শেষে জাগ্রত হইলে স্বপ্নের অলীক দুঃখ, কষ্ট, শোকভয়াদি বিদূরিত হয়—মন ক্রমশঃ প্রকৃতস্থ ও আশ্বস্থ হইয়া থাকে—সেইরূপ আজ সংসারের স্বপ্নঘোর ভাঙ্গিয়া উন্মাদিনীর মন ক্রমশঃ সুস্থির হইতে লাগিল, তাই সে এ জগতের অসার ও ক্ষণভঙ্গুর সুখাশা ত্যাগ করিয়া "কে কার" বলিয়া নির্ব্বাণপদ কামনায় বিজনবাসিনী তপস্বিনী হইয়া, পারলৌকিক কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

সতীত্ব প্রভাবে সংসারের নিদারুণ দুঃখ ক্লেশে উন্মাদিনীর দেহ ধ্বংস বা মস্তক বিকৃত না হইয়া, অনায়াসে অবশেষে সে পরম পথের পথিকা হইয়া বলিয়াছিল

"যার কেহ নাই, তারই সব আছে।
সমস্ত জগত মুক্ত তা'র কাছে ॥"

সমাপ্ত।